

# বুদ্ধের অভীত কর্ম বিপাক



উপসংহারে সুবোধিরত্ন মহাথেরো



## কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!  
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Upadhibibek Bhante

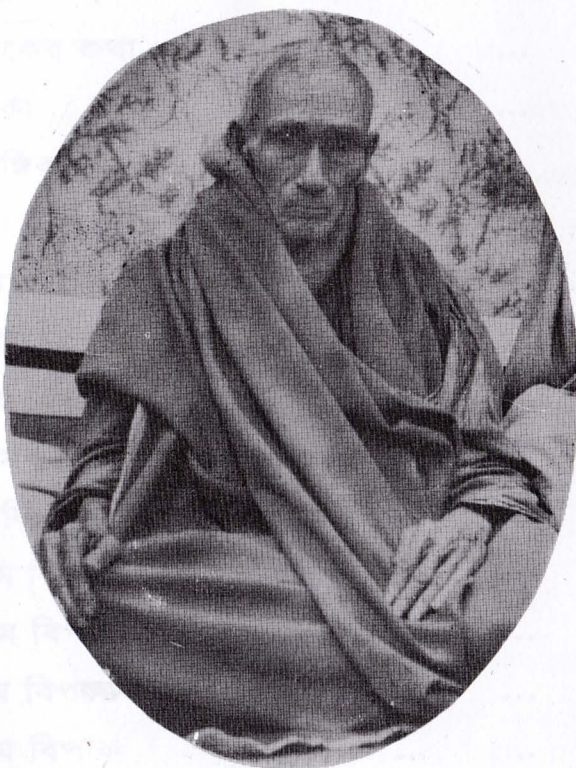
# বুদ্ধের অতীত কর্ম বিপাক



উপসংঘরাজ সুবোধিরত্ন মহাথেরো

## “বুদ্ধের অতীত কর্ম বিপাক”

- প্রথম প্রকাশকাল      ☆      ৫ই অক্টোবর ১৯৯৮ইং;  
২৫৪২ বুদ্ধাব্দ, প্রবারণা পূর্ণিমা
- প্রকাশক      ☆      উপসংঘরাজ সুবোধিরত্ন মহাথেরো  
অধ্যক্ষ, চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহার, চট্টগ্রাম।
- সার্বিক তত্ত্বাবধানে      ☆      প্রফেসর ডঃ বিকিরণ প্রসাদ বড়ুয়া  
৪৬, বৌদ্ধ মন্দির সড়ক, চট্টগ্রাম।
- সহযোগিতায়      ☆      শ্রীমৎ বোধিপ্ৰিয় শ্রামণ  
চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহার, চট্টগ্রাম।
- মুদ্রণে      ☆      ওসাকা আর্ট প্রেস  
৭, মোমিন রোড, আন্দরকিল্লা,  
চট্টগ্রাম। ফোন : ৬৩ ১০ ৮৯
- শব্দ সজ্জায়      ☆      মোহাম্মদ জাকের উল্লাহ  
মাইক্রো কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স  
আল-ফাতিহ শীপিং সেন্টার (৩য় তলা)  
১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ফোন : ৬২ ৩৩ ৫৫
- শুভেচ্ছা মূল্য      ☆      ৩০.০০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র।



পরম শ্রদ্ধেয় ৭ম সংঘরাজ অভয়তিষ্য মহাস্থবির

বুদ্ধের অতীত কর্ম বিপাক

আমার পরমারাধ্য  
শুরুদেব ৭ম অংঘরাজ  
অভয়তিষ্য  
মহামুনিবীরের  
স্মৃতির উদ্দেশ্যে  
উৎসর্গিত

-লেখক



# বুদ্ধের অতীত কর্ম বিপাক

## সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
লেখকের কথা	১
ভূমিকা	৫
প্রাসঙ্গিক বক্তব্য	১৪
প্রথম বিপাক	১৫
দ্বিতীয় বিপাক	১৬
তৃতীয় বিপাক	২২
চতুর্থ বিপাক	২৫
পঞ্চম বিপাক	২৮
ষষ্ঠ বিপাক	৩০
সপ্তম বিপাক	৩৩
অষ্টম বিপাক	৩৬
নবম বিপাক	৩৭
দশম বিপাক	৪৮
একাদশ বিপাক	৫০
দ্বাদশ বিপাক	৫২
লেখক পরিচিতি	প্রচ্ছদের শেষ পৃষ্ঠা

বুদ্ধের অতীত কর্ম বিপাক

## বুদ্ধ বাণী

ধম্মপদের ১১৭নং শ্লোক; পাপবল্লো এর ২নং শ্লোক :

পাপঞ্চ পুরিসো কয়িরা ন তং কয়িরা পুনপ্পুনং  
ন তম্হি ছন্দং কয়িরাথ, দুক্কখো পাপস্স উচ্চয়ো।

বাংলা : যদি কেহ (দৈবাৎ) পাপকর্ম করিয়া থাকে উহা যেন সে  
বারংবার না করে এবং উহাতে যেন তাহার রুচি না জন্মায়,  
(কারণ) পাপের সঞ্চয় দুঃখজনক।

ধম্মপদের ১৮নং শ্লোক; পাপবল্লো এর ৩নং শ্লোক :

পুণ্ণেপুুরিসো কয়িরা কয়িরাথেনং পুনপ্পুনং,  
তম্হি ছন্দং কয়িরাথ সুখো পুণ্ণেপুুরিস্স উচ্চয়ো।

বাংলা : যদি কেহ পুণ্যকর্ম করে, তবে উহা যেন সে পুনঃপুনঃ  
করে এবং উহাতে যেন রুচি জন্মায়, (কারণ) পুণ্যের সঞ্চয় সুখকর।



## লেখকের কথা

“নমো তস্ম ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্ম”

উর্ধ্বে ভবাগ্র ব্রহ্মলোক হইতে নিম্নতম অপায় অবধি সমগ্র জীব জগতের সমস্ত জীবই আপন কর্মাধিনে নিয়ন্ত্রিত । কর্মই আপন স্বকীয় সম্পদ স্বরূপ । পাপ-পুণ্য কর্মের ফল ভোগ একান্তই অনিবার্য । জন্ম-জন্মান্তর, কল্প-কল্পান্তর, অনাদি অনন্তকাল পর্যন্ত অনুসরণ করে একমাত্র কৃতকর্ম । এ কারণে শাস্ত্রকার বলেন-

“অবশ্য মেব ভোক্তব্যং কৃত কর্ম শুভাশুভং  
শুভাশুভং যৎ কর্ম বিনা ভোগ্যং নতৎক্ষয়” ।

শুভ ও অশুভ কর্মকৃত কর্মীকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে । ভোগ ব্যতীত কর্মের ক্ষয় নাই ।

যাহারা কর্ম বিপাক স্বীকার করেনা, নিয়তির লীলা, বিধির বিধান বলিয়া ধারণা করে, তাদেরকে বৌদ্ধদের দৃষ্টিতে মিথ্যা দৃষ্টি বা ভ্রান্ত মতবাদী বলা হয় । কর্ম বিপাক প্রসঙ্গে শাস্ত্রকার উদাহরণ দ্বারা বলেন-

যথাধেনু সহস্রেষু বৎস্রেয়া বিন্দতি মাতরং  
তথাপূর্ব্ব কৃতং কর্ম্ম কর্ত্তার মনুগচ্ছন্তি ।

সহস্র গাভীর মধ্যে যেমন বাছুর স্বীয় মাতার দিকে ধাবিত হয়, তদ্রূপ কর্মও কর্তাকে অনুসরণ করে । শাস্ত্রকার আরো বলেন-

“ন প্রণশ্যান্তি কর্ম্মানি কল্প কোটি শতৈরপি,  
সামগ্রিং প্রাপ্যকালঞ্চ ফলান্তি খলুদেহীনং” ।

জীবগণের কর্মরাশি শতকোটি কল্পেও বিনষ্ট হয়না । আনুষঙ্গিক প্রত্যয় সম্মিলন সুযোগ পাইলে নিশ্চয় ফল প্রদান করে । কর্মফলের ফলভোক্তা সর্বজ্ঞ বুদ্ধ বলেন-

“পটিঘোসো পথায়াতি ঘোসন্তে সেল কন্দর,  
তথাকতং যং যং কম্মং বিপাকোস্স আগতো” ।

শৈল-কন্দরে উচ্ছেঃস্বরে শব্দ করিলে সেই বিঘোষিত ধ্বনি ঘোষনাকারীর

নিকট পুনঃ প্রতিধ্বনিক্রমে আগমন করে। তদ্রূপ যে কোন প্রকার কর্ম সম্পাদন করনা কেন, তাহা কর্ম সম্পাদনকারীর সমীপেই পুনরাগমন করে।

এই গাথার মর্মার্থ হইল-কর্মের বিপাক দান একান্ত অনিবার্য। সেই বিপাক অচিরে, কিংবা বিলম্বে কৃত কর্মীকে পরিভোগ করিতে হয়। কৃত কর্ম হইতে অব্যাহতি পাওয়ার কাহারো সাধ্য নাই। সুতরাং কর্ম সম্পাদককে বিপাক নিশ্চয় ভোগ করিতে হয়। সুকর্মের বিপাক সুখদায়ক দুষ্কর্মের বিপাক দুঃখ দায়ক। বিপাক পরিভোগ ধর্মত বিধান। এই কারণে কর্ম-বিপাক অখণ্ডনীয় বলিয়া সকল শাস্ত্রে সর্বত্র বর্ণিত হইয়াছে।

তজ্জন্য তথাগত বুদ্ধ বলেছেন-

“কল্যাণকারী কল্যানং পাপকারী পাপকং  
যদিসং বপতে বীজং তাদিসং হরতে ফলং”।

কল্যাণজনক কর্ম সম্পাদনকারী কল্যাণ দায়ক ফলই লাভ করে। পাপকর্ম সম্পাদনকারী দুঃখ দায়ক ফলই লাভ করে। যে রূপ বীজ বপন করে, সে রূপ ফলই লাভ করে। নিম্ব (তিক্রবীজ) রোপন করিলে নিম্ব ফলই পাইবে।

লক্ষাধিক চারি অসংখ্য কল্প পূর্বে ভারত বর্ষে অমরাবতী নামে এক সমৃদ্ধশালিনী নগরী ছিল। তথায় সুমেধ নামক জনৈক ধন্যাঢ্য ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি ত্রিবেদ পারদর্শী এবং লক্ষণ শাস্ত্র ও ইতিহাস প্রভৃতি বহু শাস্ত্রে বিচক্ষণ পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন। তাই তিনি সুমেধ পণ্ডিত নামে সর্বত্র পরিচিতি হইয়াছিলেন।

সুমেধ পণ্ডিত পিতা-পিতামহ পরম্পরা সপ্তম পুরুষের অগাধ সম্পত্তির মালিক হইয়া বিশেষ চিন্তা গ্রস্ত হইলেন। তিনি চিন্তা করিলেন-“এই অতুল ধনরাশি আমার পিতা, পিতামহ প্রভৃতি সপ্তম পুরুষের সঞ্চিত সম্পদ। তাঁহারা মৃত্যুর সময় এক কর্পদকও সঙ্গে নিয়া যাইতে পারেন নাই। তৃষ্ণার বশবর্তী হইয়া সম্পদ অর্জন করিয়াছেন বটে, কিন্তু সঙ্গে নিবার জন্য কোনও উপায় উদ্ভাবন করেন নাই। এমন মোহাক্ষ জনের এই সম্পদ কোনও উপকার সাধিত হইল না। আমি কিন্তু এমন উপায় করিব এই অতুল ঐশ্বর্য যেন জন্ম-জন্মান্তর তথা কল্প-কল্পান্তর আমাকে অনুসরণ করে।

তিনি স্বভাবত ছিলেন বিরাগ প্রবন। গভীর চিন্তার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন—“ত্যাগই শান্তির উপায়”। দীন-দুঃখীকে দান করিলেন সমস্ত ধন-সম্পদ। সংসার ত্যাগ করিয়া হিমালয় পর্বতের পাদদেশে ঋষি প্রব্রজ্যা বরণ করিয়া নিজকে তপস্যায় নিয়োজিত করিলেন। তিনি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া অচিরে অষ্ট সমাপত্তি, পঞ্চ অভিজ্ঞান লাভ করিলেন।

এক শুভ মুহূর্তে অচিন্তনীয় অস্তীম প্রজ্ঞাদীপ্ত ভগবান দীপংকর বুদ্ধের সাক্ষাৎ লাভ করলেন। উগ্রতেজা সুমেধ তাপস সম্যক সম্বুদ্ধের শ্রীপাদ মূলে নিপতিত হয়ে প্রার্থনা করিলেন—তিনিও যেন তাঁহার ন্যায় মহাপ্রজ্ঞার অধিকারী হইতে পারেন।

মহাবীর্যবান সুমেধ তাপস ভগবান দীপঙ্কর বুদ্ধের নিকট বুদ্ধত্ব প্রণিধান অবধি লক্ষাধিক চারি অসংখ্য কল্প পারমী ধর্ম পূর্ণ করিয়াছিলেন। পারমী পূর্ণ করিবার সময় এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে তেই জন সম্যক সম্বুদ্ধের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন। তাহাদের নাম যথাঃ কোন্ডন্য, মঙ্গল, সুমন, রেবত, শোভিত, অনোমদর্শী, পদুম, নারদ, পদুমুত্তর, সুমেধ, সুজাত, প্রিয়দর্শী, অর্থদর্শী, ধর্মদর্শী, সিদ্ধার্থ, তিষ্য, ফুম্য, বিপশ্বী, শিখী, বেশ্যভূ, ককুসন্ধ, কোনাগমন ও কশ্যপ। এই সম্বুদ্ধগণের সময়কালীন বোধিসত্ত্বাবস্থায় এবং তৎপূর্বে কল্প কল্পান্তে তিনি যেসব কুশল-অকুশল কর্ম সম্পাদন করিয়াছেন, সেই কর্ম সমূহ তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াছে তাঁহার পরিনির্বাণ প্রাপ্তির পূর্বক্ষণ পর্যন্ত। যেহেতু কর্মই নিয়ামক, প্রাণীসমূহ যথারীতি কর্মেরই উত্তরাধিকারী।

জগতে প্রত্যেক প্রাণীই কর্মাধীন। বুদ্ধ হউক অথবা অর্হৎ হউক, অথবা দেবমানবই হউক, প্রত্যেকের জন্যই যথোচিত ধর্মের সূক্ষ্মগতি। বিশ্বচরাচরে হেতু বিনা কিছুই হয়না। ইহার মূল কারণ অবিদ্যা। অবিদ্যার হেতুতেই জন্ম-মৃত্যুর সংঘটন ঘটে এবং কর্মের হেতুতেই সুখ-দুঃখের সৃষ্টি হয়। তীক্ষ্ণক্ষুর ধারায় মধুলেহন করিয়া যেমন দুঃখের কারণ করে, তেমন প্রমত্ত ব্যক্তি আসক্তির কারণে পাপাচরণকে মধুর মনে করে, সেহেতু জন্মান্তরে মহাদুঃখ ভোগ করে।

বোধিসত্ত্বাবস্থায় এবং তৎপূর্ব জন্মে যদি অকুশল কর্ম সম্পাদন করেন পরে বুদ্ধ হইয়াও দুঃখ জনক কর্ম বিপাক ভোগ করিয়া থাকেন। পরম পুণ্যপুরুষ

গৌতম বুদ্ধ দ্বাদশ প্রকার দুঃখময় কর্মবিপাক ভোগ করার বিষয় সম্বন্ধে শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। উক্ত বিষয় সম্বন্ধে গাথায় বর্ণিত আছেঃ-

- (১) অনোতত্ত সরাসন্নে রমনী যে সিলাতরে,  
নানারতন পঙ্কেতে নানাগন্ধ বনান্তরে,
- (২) মহতা ভিক্ষু সংঘেন পরেতো লোক নায়কো  
আসিনো ব্যাকরিতও পূবব কন্ধানি অণুনো,
- (৩) সুনাথ ভিক্ষবো ময়ং যং কন্মং পকতং ময়া  
পিলোতিকস্স কন্মস্স বুদ্ধন্তে পিরি পিবিপচ্চতি।

পর্বতরাজ হিমালয় সমীপে নানারত্ন সমন্বিত সুরভিত বনান্তরে, অনোতত্ত মহাসরোবরের সন্নিহিত রমনীয় শিলাসনে মহা ভিক্ষুসংঘের পুরভাগে সমাসীন হইয়া মহাকারণিক বুদ্ধ স্বীয় অতীত কৃতকর্মের বর্ণনা করিয়াছিলেন।

শুন! ওহে ভিক্ষুগণ, আমি অতীত বুদ্ধাঙ্কুর জীবনে যে দুষ্কর্ম করিয়াছিলাম, তাহা এখন সম্যক সম্বুদ্ধ হইয়াও ভোগ করিতেছি।

### কৃতজ্ঞতা প্রকাশঃ

এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি বিভিন্নভাবে সংশোধন করিয়া দিবার জন্য বাংলাদেশের বৌদ্ধদের সর্বোচ্চ ধর্মীয়গুরু পরম শ্রদ্ধেয় মহামান্য সংঘরাজ শীলালংকার মহাথেরোর প্রতি আমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। কল্যাণীয় শ্রী জ্যোতিঃ পাল মহাথের বইয়ের ভূমিকা লিখিয়া কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। বইটি ছাপাইবার ব্যাপারে স্নেহভাজন প্রফেসর ডঃ রিকিরণ প্রসাদ বড়ুয়া যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন সেই জন্য তাহাকে আশীর্বাদ জানাইতেছি এবং তাহার উত্তরোত্তর কল্যাণ কামনা করি।

যাহারা বিভিন্নভাবে পরামর্শ দিয়া উদ্ধুদ্ধ করিয়াছেন তাহাদের প্রতি রহিল যথাযোগ্য শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ।

সকল প্রাণী সুখী হোক।

## ভূমিকা

বাংলাদেশ সংঘরাজ নিকায়ের উপসংঘরাজ ও চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সুবোধিরত্ন মহাথের মহোদয় সম্প্রতি “বুদ্ধের অতীত কর্ম বিপাক” নামে একটি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দাঁড় করিয়েছেন। ইহা তিনি সম্পাদন করেছেন প্রায়ই সূত্র পিটকের খুদ্দক নিকায়ের অপদান গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় অবলম্বনে। খুদ্দক নিকায়ে পনেরটি গ্রন্থের মধ্যে অপদান অন্যতম। অপদান শব্দের অর্থ নানাবিধ। সাধারণতঃ অপদান উপদেশ অর্থে ব্যবহৃত। এক্ষেত্রে অপদান অর্থ জীবন কাহিনী; জীবন-চরিত, পৌরাণিক বৃত্তান্ত। অপদান গ্রন্থে সম্যকসম্বুদ্ধ, পঞ্চেকবুদ্ধ, থের-থেরী সর্বমোট ছয়শত অর্হতের জীবন চরিত বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার অপদান জাতক প্রভৃতি জাতক গ্রন্থ থেকে মাত্র তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধের জীবন চরিত অবলম্বনে বারটি ঘটনার কর্ম ও কর্ম চরিত অবলম্বনে বারটি ঘটনার কর্ম ও কর্ম বিপাক সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ঐতিহাসিক ও প্রাগৌতিহাসিক বৃত্তান্তের বর্ণনা করেছেন। ইহাতে তথাগত বুদ্ধের জাতিস্মর জ্ঞান বা অলৌকিক অসীম শক্তির পরিচয় রয়েছে। এরূপ দশ প্রকার অসাধারণ ক্ষমতা বলেই বুদ্ধ তথাগত দশবল জাতিস্মর জ্ঞান বলে শুধু নিজের কর্ম বিপাকই তিনি লক্ষ্য করেনি, সমগ্র প্রাণী জগতের বৈচিত্রময় কর্ম বিপাক নীতির বর্ণনা করেছেন।

- (১) উরুবেলা মহারণ্যে সাধনা করতে গিয়ে সমগ্র পারমিতা পরিপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বুদ্ধত্ব লাভে সক্ষম না হয়ে দীর্ঘ ছয় বৎসর কাল বুদ্ধ কঠোর আত্মনিগ্রহ বা কৃচ্ছ সাধন পন্থা অবলম্বন করে কেন মহাদুঃখ ভোগ করেছিলেন?
- (২) কোন চিঞ্জা মানবী জনবহুল সভায় সম্যক সম্বুদ্ধের নামে মিথ্যা অপবাদ প্রদান করেন?
- (৩) কোন অস্তিম জন্মে বুদ্ধত্ব লাভ করার পরেও তীর্থীয় সন্ন্যাসীদের প্ররোচনায় সুন্দরী পরিব্রাজিকা নামীয় দুঃশীলা রমণী কর্তৃক প্রচারিত মিথ্যে অপবাদ তাঁকে ভোগ করতে হয়েছিল?

- (৪) কিরূপ দুষ্কর্মের প্রভাবে সুন্দরী পরিব্রাজিকা পাঁচশত ভিক্ষুসহ বুদ্ধের অপবাদ করেছিল?
- (৫) কোন কর্ম বিপাকের প্রভাবে দেবদত্ত তাঁর প্রাণ নাশের উদ্দেশ্যে সর্বতোপুরি স্থান থেকে শিলা নিক্ষেপ করেছিল?
- (৬) কিরূপ কর্মের প্রভাবে দেব দত্তরাজা অজাতশত্রুর সহযোগিতায় বুদ্ধের প্রাণবধ উদ্দেশ্যে তীরন্দাজ সৈন্য নিযুক্ত করে শত্রুতা পোষন করল?
- (৭) কি কারণে নালাগিরি হস্তী বুদ্ধকে আক্রমণ করেছিল? কি কারণে রক্ষা পেলেন?
- (৮) বেভার পর্বত হতে দেবদত্ত কর্তৃক নিক্ষিপ্ত শিলাকণার আঘাতে বুদ্ধের পদাঙ্গুষ্ঠে দোষিত রক্ত জমাট হয়েছিল। সেই দোষিত রক্ত বের করার মানসে বৈদ্যরাজ জীবক অস্ত্রোপচার করাতে যে অসহ্য যন্ত্রণাভোগ করতে হয়েছিল-তা কিরূপ কর্ম বিপাকের ফল?
- (৯) তথাগত বুদ্ধ কেন মাঝে মাঝে শিরপীড়া ও মেরুদণ্ডে ব্যথা অনুভব করতেন? কিরূপ কর্ম বিপাকে শাক্যবংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হলেন?
- (১০) তথাগত বুদ্ধ বৈরজ্ঞ দেশে পাঁচশত ভিক্ষু নিয়ে অবস্থান কালে কোন্ কর্মের প্রভাবে নিরুপায় হয়ে অশ্ব-খাদ্য শক্ত যবান্ন ভক্ষণ করেছিলেন?
- (১১) কি কর্মের প্রভাবে মাঝে মাঝে তিনি কটি ব্যথা জনিত কারণে দুঃখ ভোগ করতেন?
- (১২) দ্বাদশতম ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে-কোন্ কর্মের বিপাক স্বরূপ তথাগত পরিনির্বাণের প্রাক্কালে আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন?

বহুজন্ম-জন্মান্তরের কর্ম ও কর্ম বিপাক সম্পর্কিত এসব ঘটনা তথাগত বুদ্ধ নিজেই অপদান জাতক প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণনা করেছিলেন। আমাদের গ্রন্থকার মহোদয় সে সব গ্রন্থ থেকে বুদ্ধের ঘটনাবলী তাঁর পাণ্ডুলিপিতে উদ্ধৃত করেছেন। তিনি যা কিছু করেছেন সব অকুশল কর্ম ও অশুভ বিপাক সম্পর্কে কোনরূপ আলোচনা গ্রন্থের কোথাও নেই। তবে তাঁর মন্তব্যের মধ্যে কখনো কখনো কুশল ধর্মের আভাষ ও অকুশল ধর্মের বাণীর উদ্ধৃতি আছে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবদাত বস্ত্রে কিছু মাত্র কোন দাগ থাকলে যেমন কানদাগটাই লোকের চোখে পড়ে তেমনি তিনিও অসীম অনন্ত গুণরাশির মধ্যে বুদ্ধের বহুজন্ম জন্মান্তরের অকুশল কর্ম বিপাকই লক্ষ্য করেছেন। এতেও বুদ্ধের গুণ মহিমা প্রকাশ পেয়েছে এবং গ্রন্থকারের সম্যক দৃষ্টির পরিচয় ঘটেছে। যেহেতু জগতে কোন বিষয়ই অশিক্ষণীয় নহে। প্রত্যেক বিষয়ই শিক্ষণীয়। কোনটা ত্যাগের আকারে, কোনটা গ্রহণের আকারে। কিছুটা মাহাত্ম্য বর্ণনা থাকলে বক্তব্যের গৌরব ও পূর্ণতা বৃদ্ধি পেত। আর তাঁর আলোচ্য বিষয়গুলি যেমনি সহজবোধ্য তেমনি ভাব-ভাষা সরল স্বচ্ছন্দ্য ও প্রাজ্ঞল। তবে ভাষা বিন্যাসে কিছু কিছু গোলযোগ আছে। কিন্তু কোনরূপ জটিলতা নেই। তিনি আমাকে তাঁর গ্রন্থের ভূমিকা লিখার নির্দেশ প্রদানে যারপর নাই কৃতার্থ ও অনুগৃহিত করেছেন। প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু সরল সহজ বোধ্য হলেও লেখার অন্তর্নিহিত গূঢ়তত্ত্বের মধ্যে যথেষ্ট জটিলতা ও গুরুত্ব আছে। তা সম্যকরূপে প্রকাশ ও রহস্য উদ্ঘাটন আমাদের দ্বারা কতদূর সম্ভব হবে আমি জানিনা। তথাপি তার আদেশ পালন করার চেষ্টা করব। তাঁর ইচ্ছা পূরণ হোক।

“কন্মুনা বত্ততে লোকে কন্মুনা বত্ততে পজা,  
কন্ম সত্তা নিবন্ধনা রথস্সানী’ব যাযবে।”

জগত কর্ম প্রভাবে প্রতিনিয়ত নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, কর্ম হেতুই প্রাণীগণ জন্ম মৃত্যুর আকারে সংসার ভ্রমণ করছে। সর্ব প্রাণী কর্ম নিবন্ধন। আনি বা পেরেক আবদ্ধ হয়ে রথ যেমন আঁকাবাঁকা চলতে থাকে তদ্রূপ প্রাণীগণও কর্ম নিবন্ধন উচ্চ নীচ হীনোত্তম নানাবিধ গতি প্রাপ্ত হয়। জগৎ সৃষ্টি তত্ত্ব, জগতের বৈষম্য বৈচিত্র্য সম্পর্কে নানাবিধ মতবাদ বিদ্যমান থাকলেও বৌদ্ধ দর্শনে কর্মই ইহার একমাত্র কারণ বলে নির্দেশিত হয়েছে। কর্ম প্রাণীজগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। জড় জগতের প্রাকৃতিক বিধান, প্রক্রিয়া ও গঠন প্রণালী সব কিছুই কর্ম না হলেও কর্মের সমতুল্য বা সদৃশ। কর্ম চিন্তা-চেতনারই নামান্তর। এখন দেখব কর্ম কাকে বলে বা কর্মের স্বরূপ কি প্রকার?

তথাগত বুদ্ধ বলেন-

চেতনাং ভিক্ষবে কন্মং বদামি,  
একায় চেতনায় এক পটিসন্ধিং।



হে ভিক্ষুগন । চিত্তের চেতনাকেই আমি কর্ম বলি । এক ক্ষণিক একটি মাত্র চেতনা বা কর্ম পুনর্জন্ম সংগঠন করতে বা সুখ দুঃখ ভোগাদি ফল দান করতে সক্ষম ।

কর্মতত্ত্ব বৌদ্ধ দর্শনের এক গভীর রহস্য । জীব জগতের দৈহিক, মানসিক, আয়ু, ভোগ, জন্ম, মৃত্যুগত বৈষম্যের প্রধান কারণ । এই কর্ম অন্য কিছু নহে । প্রাণীগণ স্ব-স্ব কর্মফলে উন্নত ও অবনত হয়, সুখ দুঃখ ভোগ করে ।

কর্মের শক্তি বিচিত্র ও বহুমুখী । ইহাকে কত গুলি বিভাগে বিভক্ত করা চলে । কৃত্যানুসারে কর্ম চার প্রকার । যথা-জনক কর্ম, উপস্তুম্বক কর্ম, উৎপীড়ক কর্ম ও উপঘাতক কর্ম । জীবনের দুটি কাল । একটি প্রবর্তন ও অপরটি প্রতিসন্ধি । প্রবর্তন কাল সমগ্র জীবনের কর্ম সম্পাদনের মুখ্যকাল এবং প্রতিসন্ধি পূর্ব পূর্ব জীবনের সম্পাদিত কর্মফল প্রসূত হওয়ার প্রধান কাল ।

(১) জনক কর্ম : পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্ম প্রভাব লব্ধ যেই চেতনা রূপ, শব্দ, রসাদি বিষয়বস্তু সংগঠনে নূতনভাবে কুশলাকুশল কর্ম গঠন করে, সেই চেতনাই জনক কর্ম । চিত্ত নিত্য নব নব বিষয় বস্তুর প্রসঙ্গলাভ করে কর্ম রূপে সম্পাদিত হয় । প্রবর্তন ও প্রতিসন্ধি সময় বিপাক স্বক্ক ও কর্মজরূপ উৎপাদক কুশলা কুশল চেতনাই জনক কর্ম ।

(২) উপস্তুম্বক কর্ম : কুশলাকুশল কর্মরূপ, শব্দ, রসাদি বিষয়বস্তুর সাহচর্য্যে চেতনা যখন স্পন্দিত ও আন্দোলিত হয়ে নব আকার ধারণ পূর্বক পূর্ব চেতনা বা জনক কর্মের অনুকূল্য করে, সাহায্য করে, পরিপোষনে ও ফলোৎপাদনে সুযোগ দান করে, তখন তা উপস্তুম্বক কর্ম নামে কথিত হয় । উপস্তুম্বক অর্থ-উপকারক ।

(৩) উৎপীড়ক কর্ম : পূর্ব পূর্ব জন্ম লব্ধ চেতনা যখন রূপ, শব্দ, রসাদি বিষয়বস্তুর সংশ্রবে নব নব কর্ম গঠন করতে গিয়ে উপস্তুম্বক কর্মের সঙ্গে বিরোধ ঘটিয়ে জনক কর্মের বিপাকোৎপাদকে বাধা দেয়, দুর্বল করে ব্যাত্যয় ঘটায়, সর্বদা উৎপীড়ন করে তখন ইহাকে উৎপীড়ক কর্ম বলে । প্রতিকূলে ভাবাপন্ন হলেই উৎপীড়ক রূপে গণ্য হয় ।

(৪) উপঘাতক কর্ম : উৎপীড়ক কর্মের ন্যায় উপঘাতক কর্ম ইহার বিপরীত জাতীয় কর্মকে বাধা দেয়, দুর্বল করে, ধ্বংস করে, এমনকি জনক কর্মকে সমূলে বিনাস সাধন করে আপন আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। এই জন্য ইহাকে উপঘাতক কর্ম বলে।

ফল প্রদানের পর্যায়ক্রমে কর্ম চতুর্বিধ যথা-গুরু কর্ম, আসন্ন কর্ম, আচরিত কর্ম ও উপচিত কর্ম।

(১) গুরুকর্ম : ইহা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী কর্ম। কুশলাকুশল ভেদে ইহা দ্বিবিধ। প্রবল শক্তিশালী বলে গুরুকর্ম অব্যবহিত পরবর্তী জন্মক্ষেপে শক্তি অনুসারে বিপাক প্রদান করে। কুশল গুরুকর্ম রূপ বা অরূপ ব্রহ্মলোকে, অকুশল গুরুকর্ম হলে অব্যবহিত পরজন্মেই নরক গমন অবশ্যজ্ঞাবী।

(২) আসন্ন কর্ম : জীবনে গুরুকর্ম সম্পাদিত না হলে যে কর্ম মরণোন্মুখ জীবের পূর্বক্ষেপে সম্পাদিত হয়ে পরক্ষণে পরবর্তীভাবে জন্মরূপ ফল প্রদান করতে সক্ষম তাকে আসন্ন কর্ম বলে। জীবন ব্যাপি অন্যান্য কুশলাকুশল কর্ম সম্পাদিত হলেও মরণ মূহুর্তে সম্পাদিত মনঃকর্ম অতিক্ষুদ্র হলেও পরবর্তী ভবের গতি প্রকৃতি নির্বাচন করতে সক্ষম।

(৩) আচরিত কর্ম : কুশল বা অকুশল হোক, জীবের যে জাতীয় কর্ম সমূহ সারা জীবন ব্যাপি সম্পাদিত হয়-তা স্বভাবে সংস্কারে পরিণত হয়ে পড়ে। তা আচরিত কর্ম নামে অভিহিত। গুরু আসন্ন কর্মের অভাবে এই আচরিত কর্মই অনন্তর ভবে অর্থাৎ অব্যবহিত পর-জন্মে জন্ম বিপাক দান করে।

(৪) উপচিত কর্ম : জীবের যে সকল কুশলাকুশল কর্ম ইহ জীবনে ও অতীত জীবন পরম্পরায় ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্রভাবে সম্পাদিত হয়ে চিত্ত গর্ভে বৃহৎ স্তুপাকারে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে তাই উপচিত কর্ম। গুরু আসন্ন আচরিত কর্মের তুলনায় ইহারা ক্ষুদ্রতর ও দুর্বলতর হলেও সংখ্যাধিক্য হেতু কালে সর্বাধিক শক্তিশালী ফলপ্রসূ কর্ম গঠন করিতে সমর্থ। অকুশল গুরুকর্ম ব্যতীত অন্যান্য সকল কর্মের নির্দিষ্ট কাল অতীত হয়ে গেলে বিপাক ফলার সম্ভাবনা থাকেনা

কিন্তু উপচিত কর্মের বিপাক অনন্তর ভবে কিংবা বহু জন্মজন্মন্তরে ফলপ্রদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

প্রবর্তন বা জীবিতকালে ফল প্রদানের পর্যায় অনুসারে কর্ম চতুর্বিধ । যথা-দৃষ্ট ধর্ম বেদনীয় কর্ম, উপপাদ্য বেদনীয় কর্ম, অপর পর্যায় বেদনীয় কর্ম ও অহোসি কর্ম ।

(১) দৃষ্টধর্ম বেদনীয় কর্ম : জীবগণ কায়মনোবাক্যে এমন সব কর্ম সম্পাদন করে যার বিপাক এই জীবনেই অনুভবনীয় । ইহ জীবনেই ইহাদের ফল প্রদানের নির্দিষ্ট কাল । যদি ইহ জীবনে ফল প্রদানের সুযোগ না পায় বা বিরুদ্ধ কর্মশক্তি দ্বারা প্রতিহত হয় তাহলে পরবর্তী কোন জন্মে আর ফল দান করতে পারেনা । এই জাতীয় কর্ম-দৃষ্ট ধর্ম বেদনীয় কর্ম নামে কথিত ।

(২) উপপাদ্য বেদনীয় কর্ম : জীবের যে সকল কর্ম ইহ জীবনে সম্পাদিত হয়ে অব্যবহিত পরবর্তী জন্মেই অনুভবনীয় হয় তা-ই উপপাদ্য বেদনীয় কর্ম । পরবর্তী ভবেই ইহাদের ফল প্রদানের নির্দিষ্ট কাল । পরবর্তী ভবে অবকাশ না পেলে বা বিরুদ্ধ শক্তি দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হলে ব্যর্থ বা নিষ্ফল হয়ে যায় ।

(৩) অপর পর্যায় বেদনীয় কর্ম : প্রাণীগণের এই সকল কর্ম পরবর্তী তৃতীয় হতে পূর্ণ মুক্তি লাভ না করা অবধি যে কোন জন্মে ফলপ্রসূ হবেই । যেই জাতীয় কর্মগুলো কখনো বন্ধ্য বা নিষ্ফল হবার নহে সেই সকল কর্মই অপর পর্যায় বেদনীয় কর্ম নামে অভিহিত ।

(৪) অহোসি কর্ম : প্রাণীগণ এমন সব অসংখ্য কর্ম সম্পাদন করে যা ইহাদের অতীত দুর্বলতা হেতু নির্দিষ্ট কালে ফল প্রদান করতে অক্ষম বা বিরুদ্ধে কর্মশক্তি দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হলে বন্ধ্য বা নিষ্ফল হয়ে যায় তাই অহোসি কর্ম নামে অভিহিত । অহোসি অর্থ এক সময় ফলোদগম শক্তি সম্পন্ন ছিল কিন্তু এখন ক্ষীণ বীজ হয়ে গেছে । পূর্বোক্ত অপর পর্যায় বেদনীয় কর্ম ও অকুশল গুরু কর্ম ব্যতীত অন্য সব প্রকার কর্ম যথাকালে ফলোৎপাদনে ব্যর্থ হলে তা অহোসি কর্মে পরিণতি লাভ করে । অপর পর্যায় বেদনীয় ও অকুশল গুরু কর্মের অহোসি ভাব থাকেনা । ইহাদের ফলোদ্যম শক্তি অব্যর্থ, অমোঘ ।

এ যাবৎ যত প্রকার কর্মের প্রকার ভেদ বর্ণিত হল-প্রত্যেক কর্মই কুশলাকুশল ভেদে দ্বিবিধ ।

অভিধর্ম পিটকে চিত্ত-বীথি সংগ্রাহে অতি মহদালম্বনে চিত্তের বীথি

গমণের কথা উল্লেখ আছে তন্মধ্যে সতর প্রকার চিত্ত ক্ষণের বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রথম আট চিত্তক্ষণ এবং শেষোক্ত তিন বিপাক চিত্ত নিষ্ক্রিয়, শীতল, শূন্য। কিন্তু মাঝে সপ্ত চিত্তক্ষণ শুভাশুভ কর্মচিত্ত, সক্রিয় শক্তিশালী। এখানেই কুশলাকুশল কর্মের সৃষ্টির প্রবর্তন। এই সাতটি হচ্ছে জবন চিত্ত। এই জবনস্থানে চিত্ত স্বাভাবিক অবস্থায় সাত চিত্তক্ষণ উপলব্ধি করে। সর্ব প্রথম জবন পূর্বের কোনরূপ সঞ্চিত শক্তির অভাবে ইহার শৈশব কাল একেবারে দুর্বল। প্রথম জবনের কর্ম বিপাক যে জন্মে কর্ম সম্পাদিত হয় সেই জন্মেই ফলে (দৃষ্ট ধর্ম বেদনীয়)। অবকাশ না পেলে বা বাধা প্রাপ্ত হলে ক্ষীণ-বীজ হয়ে যায়। সপ্তম জবন পতনোন্মুখ হলেও প্রথম জীবন থেকে বলবত্তর। এজন্য ইহার বিপাক পরবর্তী জন্মে ফলে। অবকাশ না পেলে বা বাধা প্রাপ্ত হলে আর ফলে না। ক্ষীণ-বীজ বা নিষ্ফল হয়ে যায়। কিন্তু মাঝের পাঁচ প্রকার জবন চিত্তের অপর পর্যায় বেদনীয় কর্মের ফলনযোগ্য শক্তি বহু শত সহস্র জবন এমনকি পরিপূর্ণ নির্বাণ লাভ না করা পর্যন্ত সঞ্জীবিত থাকে। তবে ইতিমধ্যে অনুকূল প্রতিকূল কর্ম দ্বারা সঞ্চিত বিপাককে হ্রাস-বর্দ্ধন করা যায়। আলোকের আবির্ভাবে অন্ধকার তিরোহিত হয়। অন্ধকারের আগমণে আলোক দূরীভূত হওয়ার ন্যায় কুশলের আগমণে অকুশল ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। আবার কুশল শক্তি সমাগমে অকুশল ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

কর্মতত্ত্বের সাধারণ মৌলিক নীতি হল যদ্বারা যেরূপ কর্ম সম্পাদিত হবে তদ্বারা সেরূপ ফল ভোগ বিহিত হবে। জন্ম বা কালের ব্যবধান কিংবা ভৌতিক দূরত্ব বাধা জন্মাবে না। আমাদের বর্তমান জীবনের সুখ দুঃখ রোগাদি সবকিছু অতীত কর্মের ফল। আবার বর্তমান জীবনের কর্ম দ্বারাই ভবিষ্যৎ বা পরজন্ম নির্ধারিত হবে। অটুটকথায় বলে-

“সন্তানে যং ফলং এতং ন অঞ্সস ন চ অঞ্ঞতো”

চিত্ত প্রবাহের এক অবস্থায় যেই ফল দৃষ্ট হয়, তা অন্যের ভোগ্যও নহে অন্য হতেও সংক্রমিত হয়নি। সেই প্রবাহের পূর্বাবস্থায় কর্মসংস্কার গঠিত হয়। বিবর্তনানুসারে উত্তর কালে শত সহস্র জন্ম পরে হলেও সেই প্রবাহের মধ্যে ফল প্রতিফলিত হয়। কর্ম জীবন-প্রবাহের পূর্বরূপ। বিপাক জীবন

প্রবাহের উত্তররূপ ।

যস্মিন্বেবহি সন্তানে আহিতো কর্মবাসনা  
ফলং তত্রৈব বান্ধো'তি ।

যেই কর্ম প্রবাহে হেতু সংযুক্ত কর্মবাসনা গৃহীত ও চরিতার্থ হয় । পরবর্তীকালে সেই প্রবাহেই সম্পাদিত কর্ম ফলপ্রসূ হয়ে থাকে অন্যত্র নহে । কোন কোন কর্ম ইহার বিরুদ্ধ কর্মের বলবত্তা দ্বারা ব্যাহত হয় । আবার কোন কোন কর্ম সমজাতীয় কর্ম শক্তি দ্বারা অধিকতর শক্তিশালী হয় । কোন কর্মের ফলোৎপাদন স্বতঃপ্রবৃত্ত নহে । সহকারী প্রসঙ্গ হেতু প্রত্যয় বা পুরুষ-কারের উপর নির্ভরশীল কারণ-

“কস্মস্ বিপাক দানং হি অবিজ্জা তহ্মাদি  
বসেন উপাধি পচয়ন্তরেনেব হোতি”

অবিদ্যা তৃষ্ণাদি অকুশল বা স্মৃতি শ্রদ্ধাদি কুশল সহকারী কারণ সংযুক্ত হলেই কর্ম ফলপ্রসূ হয়, অন্যথা নহে । যেমন- একটি বীজের অভ্যন্তরে বৃক্ষের কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পত্র-পল্লব, ফুলফল ইত্যাদি হেতু সুগুণাকারে বর্তমান থাকে । কালে জল মৃত্তিকাদি অনুকূল উপাদান লাভে অঙ্কুরিত হয় এবং সর্বাবয়ব পরিষ্কৃত হয় । উপাদানের অভাবে কিছুকাল পরে বীজ নষ্ট হয়ে যায়- তদ্রূপ প্রচ্ছন্ন শক্তির আকারে কর্ম ও জীবন সন্তাতির মধ্যে বর্তমান থাকে । কর্মের বিপাক দানও অনেক হেতু প্রত্যয় ও উপাদানের উপর নির্ভর করে । অন্যথা বিপাক উৎপন্ন হয়না ।

প্রাণীগণ কর্মের বিশাল সমুদ্রে অনন্ত কোটি কর্ম সম্পাদন করে থাকে । যত কর্ম সম্পাদন করে সমুদয় কর্মের ফলই যদি ভোগ করতে হয় তবে জীবের জীবন মুক্তির অবকাশ কোথায়? কর্মমাত্রই ফলপ্রসূ হয়না । সকল কর্মের সম্ভোগ সর্বদা নিরপেক্ষ বা অনিবার্য নহে । কর্মের যোগ বিয়োগ আছে । প্রত্যেক কর্মই ফল বাহক নহে ।

“কতত্তা পচয়া এতে ন নিচ্ ফলবহা”

প্রাণীগণ সকল সময় এক প্রকার কর্ম করেনা। কখনো শুভ, কখনো অশুভ  
৭। বিমিশ্র কর্ম সম্পাদন করে। কর্মের বিভিন্নরূপ আছে। চিত্ত নদী উভয়তঃ  
৭।হিনী, কল্যাণ কূলেও বাহিত হয় আর পাপকূলেও বাহিত হয়।

দস্যু অঙ্গুলিমাল নয়শত নিরানুদ্বই জন নর হত্যা করলেন। তাঁর  
দৌরাত্ন্যে মানুষ দেশ ছাড়া হয়ে গেল। পরদিন তিনি অর্হৎ অঙ্গুলিমাল স্থবিরে  
পরিণত হলেন। রাজগৃহের বাত কালক নামে এক চোর ঘাতক পদে নিযুক্ত  
রাজ কর্মচারী ছিলেন। পঞ্চাশ বৎসর ধরে তিনি অগণিত নরহত্যা করলেন।  
হঠাৎ সৌভাগ্যক্রমে তাবতিংস স্বর্গে উপনীত হলেন। এখন প্রশ্ন হল-অঙ্গুলিমাল  
কোন পাসপোর্টের সুযোগে হঠাৎ প্রবৃতি রাজ্যে অতিক্রম করে নিবৃতি  
রাজ্যে পৌছলেন এবং বাত কালক পঞ্চাশ বৎসর নর হত্যা করেও কোন  
শক্তির প্রভাবে হঠাৎ তাবতিংস স্বর্গে উপনীত হলেন। অথচ নরহত্যা জনিত  
কর্মের ফলভোগ তাদের আর করতে হলনা। জীবন মুক্তি ও স্বর্গ গমনে বাধা  
জন্মাল না। সব অপকর্ম নিষ্ফল বা বন্ধা হলে গেল। তাঁদের জীবন মুক্তি ও স্বর্গ  
গমনের উৎস বা স্বরূপটা কিরূপ?

আমাদের গ্রন্থাকার পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সুবোধিত মহাস্থবির নবুতি পর  
প্রাচীন প্রাজ্ঞ পুরুষ। বিবিধ জনহিতকর ও সমাজ কল্যাণকর কার্যে তাঁর  
অবদান সর্বজন বিদিত। এই জরা-ব্যাধিগ্রস্থ মহাস্থবির এখনো ধর্ম ও সমাজের  
উন্নতি কল্পে বই পুস্তক লিখন পঠনে ব্যাপৃত। জনগণের অজ্ঞাতসারে তাঁর  
অন্তর জগতে জনগণের জন্য কিরূপ মৈত্রী করুণার স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে  
চিত্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই উপলব্ধি করতে পারেন। আমি তাঁর সুদীর্ঘ নিরাময়  
জীবন প্রার্থনা করি।

শ্রী জ্যোতিঃপাল মহাথের

২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮ ইংরেজী

অধ্যক্ষ

বিশ্বশান্তি প্যাগোডা

জোবরা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

## প্রাসঙ্গিক বক্তব্য

পরম শ্রদ্ধেয় উপসংঘরাজ সুবোধিরত্ন মহাথের একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু কুল গৌরব। বহু গুণে গুণান্বিত ভিক্ষু ব্যক্তিত্ব। তিনি আমার পরম আত্মীয়। ঠেগরপুণিতে থাকা কালীন সময় হতেই আমি তাঁর সান্নিধ্যে আসি এবং স্নেহসিক্ত হই। স্নেহধন্য এই দীর্ঘ সময়কালে তাঁর লিখা কয়েকটি বই এর কথা তিনি আমাকে প্রায়ই বলতেন। “বুদ্ধের অতীত কর্ম বিপাক” বইটি ছাপা সম্পর্কে আমি তাঁকে সহযোগিতা দেবার প্রতিশ্রুতি দিই। একদিন তিনি আমাকে বইয়ের পাভুলিপি পড়ার জন্য দিলে আমি দেখি পাভুলিপিটি অগোছালো। আবার নূতন করে পাভুলিপি তৈরী করার জন্য অনুরোধ জানালে তা তৈরী করতে বছর খানেক সময় চলে যায়। পরিষ্কারভাবে লিখা পাভুলিপি পড়ে আমি আনন্দ অনুভব করি এবং বইটি ছাপাবার পদক্ষেপ গ্রহণ করি। ৯৭ বছর বয়স্ক এই ভিক্ষু ব্যক্তিত্বের বইটি ছাপানোতে সহযোগিতা করতে পেরে আমি আনন্দিত। প্রকৃতপক্ষে কর্মফল সকলকেই ভোগ করতে হবে এই বইটি পড়লে তা’ পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করা যায়। গৌতম সম্যক সম্বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণের আগে কৃত কর্মের ফল পুঞ্জানুপুঞ্জরূপে ভোগ করে গেছেন যদিওবা সম্যক সম্বুদ্ধের কৃত কর্ম ফল ভোগের পদ্ধতি সম্পর্কে পণ্ডিত ব্যক্তির ভিন্নমত পোষণ করেন। তবুও শ্রদ্ধেয় উপসংঘরাজ সুবোধিরত্ন মহাথেরো লিখিত ‘বুদ্ধের অতীত কর্ম বিপাক’ বইটি আমাদের কর্ম বিপাক সম্পর্কিত জ্ঞান ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করবে। মূলতঃ সমকালীন যুগে এই বইটি নূতন দৃষ্টিতে কর্মফলে বিশ্বাসী বৌদ্ধদেরকে উদ্বুদ্ধ করবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি এই বইয়ের বহুল প্রচার কামনা করি। আমি পরম শ্রদ্ধেয় উপসংঘরাজ সুবোধিরত্ন মহাথেরোকে সশ্রদ্ধ বন্দনা জানাই।



## প্রথম বিপাক

অচিন্তনীয় গুণ সম্পন্ন ভগবান কশ্যপ বুদ্ধের সময় গৌতম বুদ্ধাংকুর জ্যোতিঃপাল ব্রাহ্মণ বংশে জন্মধারণ করিয়াছিলেন। জাতি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণবংশে জন্ম নিয়া বিদ্যা বুদ্ধিতে নিপুণ ও সুপণ্ডিত হইলেন। অধিকতর ধন সম্পদেও অতিশয় ধনশালী হইলেন। তাই আত্ম অভিমানে স্ফীত হইয়া মুখে যাহা ইচ্ছা বলিতে সংকোচ করিতেন না। বুদ্ধাংকুর কশ্যপ অভিনিষ্ঠমণ করিয়া ছয় দিন গভীর ধানে নিমগ্ন হইয়া বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন। ইহা অতি আশ্চর্য বলিয়া জনগণ কশ্যপ বুদ্ধের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই প্রশংসা বাক্য শুনিয়া ব্রাহ্মণ জ্যোতিঃপাল নিন্দাচ্ছলে বলিলেন এই মুণ্ডক কশ্যপ ছয় দিনে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছে বলিয়া তোমরা প্রচার করিতেছ। ছয় দিনে দুষ্কর চর্য্যা সম্পাদন করিয়া বুদ্ধত্ব লাভ করা একান্ত অসম্ভব। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি কি এত সহজ! আমি ছয় দিনের পরিবর্তে ছয় বৎসর সাধনা করিয়া যদি বুদ্ধ হইতে পারি তাহাও আমার পক্ষে সৌভাগ্য মনে করিব। এই বাক্য তাঁহার মুখ হইতে অলক্ষিতে নিঃসৃত হইয়াছিল। এই কারণে শেষ জন্মে সিদ্ধার্থ রূপে জন্ম ধারণ করিয়া মহা ভিনিষ্ঠমণ করার পর উরুবিল্ল বনে অনাহার অনিদ্রায় মহাদুঃখ সহকারে ছয় বৎসর জীবন মরণপণ করিয়া সাধনা করিয়াছিলেন।

ইহা পূর্ব জন্মে কথিত বাচনিক পাপের পরিণাম। এই বাচনিক কর্মের বিপাক স্মরণ করিয়া বাক্য সংযম করা উচিত। পূর্ব জন্মের কর্ম ফল সম্বন্ধে অপদান গ্রন্থে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

অবচাহং জ্যোতিঃপালো সুগতং কসসপং তদা,  
কুতোনু বোধিমুন্ডস্ বোধিপরম দুল্লভা।  
তেন কস্মেন বিপাকেন আচরিং দুষ্করং বহুং  
হৃদ্বসানরু বেলায়ং ততো বোধি সমাপুনিং,  
নাহং এতেন মগ্গেন পাপুনিং বোধিমুত্তমং,  
কুমগ্গেন গবেসিস্মং পূৰ্ব্ব কস্মেন বারিতো।

ভিক্ষুগণ, মহাকারুণিক কশ্যপ যখন বুদ্ধত্ব লাভ করেন তখন আমি জ্যোতিঃপাল ব্রাহ্মণরূপে জন্ম ধারণ করিয়াছিলাম। সেই মহাকারুণিক বুদ্ধকে

অহংকার ও অবজ্ঞা করিয়াছিলাম-মুন্ডিত মস্তক কশ্যপ ছয়দিন মাত্র দুষ্কর চর্যা সম্পাদন করিয়া সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। তাহা কখনও সম্ভব নহে। আমি অহংকার ও অভিমানে এই বাচনিক পাপ করিয়াছিলাম। আত্মকৃত কর্মই আমাকে দুঃখ-দায়ক বিপাক দানের প্রধান হেতু। সেই অতুলনীয় শ্রীসম্পন্ন কশ্যপ বুদ্ধের প্রতি অবজ্ঞা সহকারে দুর্বাক্য বলাতে উরুবেলা মহাবনে ছয় বৎসর অনাহার অনিদ্রায় মহাদুঃখ বরণ করিতে হইয়াছিল। শরীরে অস্থি-চর্ম মাত্র অবশিষ্ট ছিল। জীবন মরণ পণ করিয়া কঠোর সাধনায় নিরত হইয়াছিলাম। দুঃসহ দুষ্করনীয় কর্ম সম্পাদন করিয়া সুদুর্লভ সম্যক সম্বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলাম। আমি সুপথে সুখ-স্বচ্ছন্দে নিজেকে পরিচালিত করিয়া শ্রেষ্ঠ বোধি জ্ঞান লাভ করিতে পারি নাই। অতীতের কৃত কর্মের বিপাকে পড়িয়া দুর্গতির সঞ্চর হয়। তাই অনার্যোচিত আত্মনিগ্রহ পন্থায় সাধনা করিয়া মহাদুঃখ ভোগ করিয়াছি।

-০-

## দ্বিতীয় বিপাক

অতীতে গৌতম বোধিসত্ত্ব নীচ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অজ্ঞাতনামা ও ধূর্ত প্রকৃতির ছিলেন। সে সময়ে মহাঋদ্ধি ও মহানুভব সম্পন্ন “সুরভি” নামক এক পশ্চেক বুদ্ধ কোন কারণবশতঃ মুনালী ধূর্তের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি তখন প্রত্যেক বুদ্ধকে দেখিয়া বলিলেন “এই শ্রমণ দুঃশীল এবং পাপধর্ম পরায়ণ” ইত্যাদি বলিয়া নিন্দা ও অপবাদ করিয়াছিলেন। এই অকুশল কর্মের কারণে বহু সহস্র বৎসর নরকাদি মহাদুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন। পরিশেষে পারমী ধর্মে পূর্ণতা লাভের পর অন্তিম জন্ম গ্রহণ করিবার জন্য তুষিতপূরে অপেক্ষা করিতেছিলেন।

তখন তীর্থযগণ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া মহাজনগণকে প্রবঞ্চনা পূর্বক বাষট্টি প্রকার ভ্রান্ত ধারণাপূর্ণ মিথ্যাদৃষ্টি প্রচার করিতেছিল। তখন আমাদের বোধিসত্ত্ব তুষিত স্বর্গ হইতে চ্যুত হইয়া শাক্যবংশে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন এবং অনুক্রমে বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন। তখন তীর্থযগণ সূর্যোদয়ে জোনাকীর ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়া লাভ সংকার বিহীন হওয়াতে ভগবান বুদ্ধের প্রতি তাহারা বিদ্রোষ পরায়ন হইল।

তৎকালে রাজগৃহ শ্রেষ্ঠী গঙ্গায় জাল বেটন পূর্বক জাল ক্রীড়া করিবার সময় ঘট প্রমাণ এক খন্ড রক্ত চন্দন প্রাপ্ত হইলেন। শ্রেষ্ঠী তাহা দর্শনে চিন্তা করিলেন, আমার গৃহে এইরূপ বহু রক্ত চন্দন আছে। তাহা সূত্রধর দ্বারা পাত্র নির্মাণ করাইয়া তাহা সুউচ্চ বাঁশের অগ্রভাগে বন্ধন করিয়া রাখিব। অতপর চরাইয়া সর্বত্র ঘোষণা করিলেন-“যাহারা ঋদ্ধি বলে আকাশ পথে আসিয়া পাত্রটি গ্রহণ করিবেন উহা তাঁহারই হইবে এবং আমি তাঁহার প্রতি ভক্তি পরায়ণ হইব।” এইরূপ ঘোষণা করা হইলে, তীর্থযগণ চিন্তা করিলেন-“আমরা নষ্ট হইলাম, নষ্ট হইলাম”। তাহারা অনুতপ্ত হইয়া পরামর্শক্রমে এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল-তীর্থীয় প্রধান বলিল-“আমি বাঁশের সমীপে গিয়া আকাশে উল্লঙ্ঘনের ভান করিলে তখন তোমরা ছাই (ভস্ম) কাঠের পাত্রের জন্য ঋদ্ধি প্রদর্শন করিবেন না, বলিয়া আমার গ্রীবায় ধরিয়া বারণ করিবে”। তখন তাঁহার পরামর্শানুক্রমে মহাকোলাহল শব্দে উহা সম্পাদন করিল। তখন পিণ্ডোল ভরদ্বাজ ও মহামোগগল্লায়ন ত্রিগাবুত প্রমাণ পাষণ পর্বতের মস্তকে দাঁড়াইয়া তাহারা পিণ্ডাচরণে যাইবেন উদ্দেশ্যে চীবর পারুপণ করিতেছিলেন। তখন তীর্থীয়দের এইরূপ কোলাহল শ্রবণ করিয়া মোগ্গল্লায়ন পিণ্ডোল ভরদ্বাজকে বলিলেন-“ভরদ্বাজ, তুমি আকাশ পথে যাইয়া পাত্রটি গ্রহণ কর”। ভরদ্বাজ বলিলেন-“ভন্তে, ঋদ্ধিবানদের মধ্যে ভগবান আপনাকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। সুতরাং আপনিই পাত্রটি গ্রহণ করুন।” মোগ্গল্লায়ন বলিলেন- “আমি বলিতেছি, তুমি পাত্রটি গ্রহণ কর। তখন ভরদ্বাজ ত্রিগাবুত পরিমাণ সেই পাষণ পর্বত পদতলে সংলগ্ন অবস্থায় আকাশে উঠিয়া সমগ্র রাজগৃহ নগরী আচ্ছাদন করিলেন। তখন নগরবাসী সকলে স্ফটিক পর্বতে সেলাই করা লোহিত সূত্রের ন্যায় স্থবিরকে দর্শন করিয়া ভীতস্বরে ও চীৎকারে বলিল-“ভন্তে ভরদ্বাজ, আমাদিগকে রক্ষা করুন।”

তখন স্থবির সেই পর্বত যথাস্থানে নিয়া গিয়া বিসর্জন করিলেন এবং ঋদ্ধি বলে গিয়া ঐ পাত্রটি গ্রহণ করিলেন। এই ব্যাপারে সমস্ত নগরে মহাকোলাহলের সৃষ্টি হইল।

তখন ভগবান বেনুবনারামে বসিয়া এই কোলাহল শ্রবণ করিয়া আনন্দ

স্ববিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন-“আনন্দ নগরে এত কোলাহল কেন? প্রত্যুত্তরে আনন্দ বলিলেন-“ভণ্ডে! কুন্ডল ভরদ্বাজ ঋদ্ধি প্রভাবে চন্দন পাত্র গ্রহণ করাতে নগরবাসীরা আনন্দ ধ্বনি করিতেছে।” ইহা শুনিয়া বুদ্ধ ভবিষ্যতে পরোপবাদ হইতে মুক্তির জন্যে পাত্রটি আনাইয়া তাহা ভস্ম করাইলেন এবং তাহাই পেষণ চক্ষুরোগের অঞ্জনের জন্যে ভিক্ষুগণকে প্রদান করিলেন। তৎপর ভগবান বলিলেন “হে ভিক্ষুগণ, কেহ ঋদ্ধি প্রদর্শন করিবে না। যে ঋদ্ধি প্রদর্শন করিবে তাহার ‘দুষ্কট’ আপত্তি (দোষ) হইবে।” ইহা বলিয়া ভগবান শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করিলেন।

তখন তীর্থিয়গণ মনে করিল-“শ্রমণ গৌতম তাঁহার শ্রাবকদের প্রতি শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করিয়াছেন, সুতরাং শ্রাবকেরা প্রানান্তেও শিক্ষাপদ লংগন করিবেনা এবং গৌতম ও স্বয়ং ঋদ্ধি প্রদর্শন করিবেন না।” এইরূপ মনে করিয়া তাহারা প্রকাশ্যে কোলাহলের সহিত ঘোষণা করিতে লাগিল। আমরা ইদানীং ঋদ্ধি প্রতিহার্য করিয়া থাকি। সুতরাং এখন আমরা শ্রমণ গৌতমের সহিত প্রতিযোগিতা প্রদর্শনের ইচ্ছা করি। রাজা বিম্বিসার ইহা শ্রবণ করিয়া ভগবানের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বন্দনান্তে বলিলেন-“ভদন্ত তীর্থিয়গণ আপনার সহিত ঋদ্ধি প্রতিযোগিতা প্রদর্শন করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন।” ভগবান বলিলেন-“মহারাজ! আমিও ঋদ্ধি প্রদর্শন করিব। রাজা বলিলেন-“ভদন্ত ঋদ্ধি প্রদর্শন না করিবার জন্যে আপনি শ্রাবকদের প্রতি শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করিয়াছেন তাই নয় কি?” বুদ্ধ বলিলেন-“মহারাজ, আপনাকে একটি প্রশ্ন করিব। আপনার আম্র উদ্যানের আম্র ফলাদি ভক্ষণকারীর প্রতি যেই পরিমাণ দন্ডের ব্যবস্থা আছে, সেই দন্ড কি আপনার প্রতি প্রযুক্ত হইবে?” না ভণ্ডে, আমার প্রতি কোন দন্ডের বিধান নাই। তদ্রূপ মহারাজ, আমার শ্রাবকদের প্রতি শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত হইলেও কিন্তু তাহা আমার জন্যে প্রযোজ্য নহে।” “ভদন্ত, কোথায় ঋদ্ধি প্রতিহার্য প্রদর্শিত হইবে?” শ্রাবস্তীর সমীপে গভম্বে বৃক্ষমূলে মহারাজ।” “সাধু ভণ্ডে, তাহা আমরাও দর্শন করিব।”

গণ্ডম্বে বৃক্ষমূলে ঋদ্ধি প্রদর্শন করা হইবে এই খবর জানিতে পারিয়া তীর্থিয়গণ নগরের চারিদিকের আম্রবৃক্ষ ও আম্রবৃক্ষের অঙ্কুর পর্যন্ত ছেদন করাইল।

নগরের সুবৃহৎ ময়দানে সুবৃহৎ মঞ্চ। মঞ্চের উপর মঞ্চ এবং তাহাতে উচ্চ সিঁড়ি স্থাপন করা হইল। জম্বুদীপবাসী জনগণ একত্রিত হইয়া পূর্বদিকে দ্বাদশ যোজন পরিমিত স্থান পরিব্যাপ্ত হইল। ভগবান যথাসময়ে আষাঢ়ী পূর্ণিমা দিবসে প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্বক নির্দিষ্ট আসনে আসিয়া উপবেশন করিলেন। সে সময় গোপ্তা নামক উদ্যান পাল রক্তবর্ণ পিপীলিকার পত্র-বাসভ্যন্তরে সুপক্ক আম্র দর্শন করিয়া চিন্তা করিল-“যদি আমি এই অকাল পক্ক আম্রটি রাজাকে প্রদান করি তাহা হইলে অনেক পুরস্কার পাইব। আর ভগবানকে যদি দান করি তাহা আমার ইহকালের মহাকল্যাণ সাধিত হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া উহা ভগবানকে দান করিল। ভগবান তাহা গ্রহণ করিয়া আনন্দ স্থবিরকে বলিলেন-“আনন্দ, এই আম্রটি মর্দন করিয়া পানীয় প্রস্তুত করিয়া আমাকে দাও।” আনন্দ স্থবির সেইরূপ করিয়া তাহা ভগবানকে দিলেন। ভগবান আম্রস পান করিয়া আঁটিটা উদ্যান পালকে দিয়া ইহা রোপন করিতে আদেশ দিলেন। উদ্যান পাল ভগবান কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া বালুকা তুলিয়া ভগবানের নির্দেশিত স্থানে উহা রোপন করিল। তখন আনন্দ উহাতে জল সিঞ্চন করিলেন। তৎক্ষণাৎ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া সহসা মহাজনগণের দৃশ্যমনি অবস্থায় আলোকিত ভাবে আম্রবৃক্ষ সংবর্ধিত হইয়া শাখা প্রশাখায় পত্র-পল্লবে ও ফুল ফলে সুশোভিত বিরাট আম্রবৃক্ষে পরিণত হইল। সেই মুহূর্তেই চমৎকার দৃশ্য আম্রফল সমূহ পরিপুষ্ট হইল এবং তখনই পরিপক্ক হইয়া চতুর্পার্শ্বে অজস্র পদ্মফুল পড়িতে লাগিল। ভিক্ষু সংঘ আম্র ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। অগণিত আম্রফল মহাজনসংঘ খাইয়াও উনতা বা নিঃশেষ করিতে পারিলনা। অন্যান্য জনসাধারণ দেখিল বুদ্ধের অপূর্ব ঋদ্ধির নিকট শোচনীয় পরাজয় ঘটিল তীর্থীয় সন্ন্যাসীদের। অতঃপর ভগবান বহুপ্রকার অলৌকিক ঋদ্ধিপ্রদর্শন করিলেন এবং সমাগত মহাপরিষদে সিংহনাদে ধর্মদেশনা করিলেন।

ধর্মপদার্থ কথা বর্ণনানুসারে মহাঋদ্ধি প্রদর্শনে তীর্থীয়গণকে দমন ও দর্পচূর্ণ করিয়া পূর্ব বুদ্ধগণের আচরিত নিয়মে তাবতিংস ভবনে চলিয়া গেলেন। তথায় বর্ষাবাস গ্রহনান্তর তিন মাস যাবৎ নিরন্তর অভিধর্ম দেশনা করিয়া মাতা প্রমুখ বহু দেবগণের স্রোতাপত্তি ইত্যাদি ফল লাভ করাইলেন। বর্ষাবাস শেষ হইলে দেবলোক হইতে অবতরণের সময় বহু দেব ব্রহ্মগণ পরিবৃত্ত হইয়া

সাংকাশ্য পুরদ্বারে অবতরণ করিয়া অসংখ্য জনগণের প্রতি করুণা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেই অপ্রমেয় জনসংঘের ভগবান ও ভিক্ষুসংঘের প্রতি শ্রদ্ধা ও মহাসমাদর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল।

তখন তীর্থিয়গণের লাভ সৎকারের ভীষণ পরিহাসী ঘটিল। তাই তাহারা মর্মান্তিক দুঃখে ও মহাশ্কেভে অধোমুখী হইয়া বিমিতে লাগিল।

অতঃপর তীর্থিয়গণের উপাসিকা রূপবতী চিঞ্চা তাহাদের আশ্রমে আসিয়া গুরুগণকে দুঃখী দুর্মনা ও বিমর্ষ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল- “প্রভু আপনাদের ঈদৃশ অশান্তিভাব দেখিতেছি কেন?” তীর্থিয়গণ মর্মান্তিক দুঃখে বলিল- “ভাগিনী, তুমিতো সুখে আছ। আমাদের মনোবেদনা তুমি কিরূপে বুঝিতে পারিবে?” “প্রভু, কি হইয়াছে জানিতে পারি কি?” “ভাগিনী, শ্রমণ গৌতমের এদেশে আগমন হইতে আমরা লাভ সৎকারে বঞ্চিত হইয়াছি। দেশবাসীরা আমাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ”। “প্রভু! এ বিষয়ে আমার কি করা কর্তব্য?” “ভাগিনী, তুমি শ্রমণ গৌতমের দুর্গাম রটনা করিতে পারিবে কি?” চিঞ্চা সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বলিল- “নিশ্চয়ই পারিব। সে ভার আমার উপর রহিল, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন।” এইরূপ আশ্বাস বাক্যে উৎসাহ প্রদর্শন করিল। চিঞ্চা সেই দিন সন্ধ্যার সময় জেবতবনে যাওয়ার ভান করিয়া তীর্থিয়দের আশ্রমে রাত্রিয়াপন করিয়া সকাল বেলা নগর বাসীরা সুগন্ধ পুষ্পমাল্যাদি পূজার উপকরণ হস্তে বুদ্ধকে পূজা ও বন্দনার জন্য যাইবার সময়ে চিঞ্চা যেন জেতবন হইতে আসিতেছে এমন ভাব দেখাইত। জনগণ তাহাকে দেখিয়া ‘কোথায় হইতে আসিতেছে’ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত- ‘আমি কোথায় হইতে আসিতেছি তাহা জানিবার তোমাদের দরকার কি?’ এইরূপে কিছুদিন গত হইলে সে নিজেই প্রচার করিতে লাগিল গন্ধ কুটিরে রাত্রিয়াপন করিয়া আসিতেছে।? চিঞ্চার এই মিথ্যা অপবাদ জনগণ বিশ্বাস করিল না।

অতঃপর চিঞ্চা এক সময় গোলাকারে প্রস্তুত কাঠের টুকরা উদরে বন্ধন করিয়া গর্ভবতীর মত ভান করিতে লাগিল। উহার কিছুদিন পরে একদিন রাজাসহ ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকার মধ্যে ভগবান বুদ্ধ উপবিষ্ট হইয়া মহাপরিষদে ধর্মদেশনা করিতেছেন। এমন সময় চিঞ্চা উপস্থিত হইয়া বলিল

ওহে মহা শ্রমণ মৃদু মৃদু হেসে হেসে তুমি ধর্ম দেশনা করিতেছ তোমার দ্বারা আমি যে গর্ভিনী হইয়াছি জান না? গর্ভবতীর যাহা প্রয়োজন তাহার ব্যবস্থা কোথায়? এখনও সূতিকা গৃহের কোন ব্যবস্থা করিলে না। অজানার মত নিশ্চেষ্ট হইয়া আছো-ইহার কারণ কি?” বুদ্ধ বলিলেন-“ভগিনী ইহার সত্যতা সম্বন্ধে তুমি জান। এ বিষয় আর আমি কি জানি?” সে বলিল হাঁ হাঁ, এ বিষয়ে তুমি ও আমি উভয়ে জানি বৈ কি!

তখন ক্ষান্তি মৈত্রীর মূর্ত প্রতীক অনন্য সাধারণ বুদ্ধ নীরবে শান্তভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। জয়মঙ্গল গাথায় বর্ণিত হইয়াছে-

কত্বান কট্ট মুদরং ইব গণ্ডিনিয়া,  
চিঞ্চায় দুট্ট-বচনং জনকায় মজ্জে;  
সন্তেন সোম বিধিনা জিতবা মুনিন্দো,  
তন্তেজসা ভবতুতে জয় মঙ্গলানি।

বাংলায়-

চিঞ্চা নামে দুষ্টা-নারী গর্ভিনীর মত,  
কাষ্টের উদর করি বলে মিথ্যা কত;  
সভাস্থলে এসে বলে প্রদুষ্ট বচন,  
শান্ত সৌম্য বিধিবলে বুদ্ধ জয়ী হন;  
মুনীন্দ্র হলেন জয়ী, এ সত্য প্রভায়  
জয় ও মঙ্গল ধারা বর্ষুক সবায়।

সেই ক্ষণে দেবরাজ শত্রুর পাণ্ডুকম্বল শিলাসন উত্তপ্ত হইল। দেবরাজ চিন্তা করিয়া সমস্ত বিষয় জানিতে পারিলেন। তিনি এক দেব পুত্রকে আদেশ করিলেন। তুমি মুষিক রূপ ধারণ করিয়া চিঞ্চগর কাষ্টোদরের বন্ধন রজ্জু ছেদন কর। তৎমুহুর্তেই দেবপুত্র আসিয়া দেবরাজের নির্দেশ পালন করিল। চিঞ্চগর উদরের বন্ধন রজ্জু ছিন্ন হইলে দারুমন্ডল পড়িয়া চিঞ্চগর পায়ে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইল। সেই ধর্মসভায় সম্মিলিত জনগণ চিঞ্চাকে তিরস্কার ও প্রহার করিয়া ধর্মসভা হইতে বহিস্কার করিয়া দিল। সভাস্থল হইতে বাহিরে যাওয়া মাত্র মহা পৃথিবী ভীষণ শব্দে বিদীর্ণ হইয়া অবীচি নরক হইতে অগ্নিশিখা উথিত হইল।



তখন অবীচি নরক তাহাকে গ্রাস করিল। তজ্জন্য অপদান গ্রন্থে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে-

- (১) সৰ্ব্বাভিভু বুদ্ধস্ নন্দনামসি সাবকো  
তং অব্ভকখায় নিরয়ে চিরং সঙ্চরিতং ময়ং

বাংলা : সৰ্বাভিভু বুদ্ধের নন্দ নামক শ্রাবক ছিলেন অর্হৎ। এই শ্রাবককে আমি দুঃশীল বলিয়া দুর্গাম করিয়াছিলাম। তজ্জন্য সুদীর্ঘ কাল আমাকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে।

- (২) দস বস্ সসহস্ সানি নিরয়ে সংসরিং চিরং  
মনুস্ ভাবং লদ্ধাহং অস্ত্রকখং বহুং লভিং

বাংলা : আমি দশ হাজার বৎসরাধি নরক যাতনা ভোগ করিয়া ও মনুষ্য জন্ম লাভ করিলে বহু দুর্নামের ভাগী হইয়াছিলাম।

- (৩) তেন কস্ম বিপাকেন চিঞ্চা মানবিকামমং  
অব্ভাচিক্খ অভূতেন জন কাযস্ আগতো।

বাংলা : সেই পূর্বকৃত কর্মের কারণে চিঞ্চা নাম্নী নারী জনসমাগমে আমার নামে মিথ্যা অপবাদ প্রচার করিয়াছিল।

-০-

### তৃতীয় বিপাক

অতীতে বহুকল্প পূর্বে গৌতম বোধিসত্ত্ব অকুশল কর্ম বিপাকে বারানসীর অজ্জাতনামা দরিদ্রের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাতাপিতা তাঁহার নামকরণ করিয়াছিলেন- ‘মুনালী’। তিনি মদ্যপায়ী মাতালদের সঙ্গে সর্বদা মেলামেশা করাতে তিনিও একজন মদখোর নামে পরিচিত হইলেন। বাল্যকালে সংসঙ্গ ও বিদ্যাশিক্ষার অভাবে পরিণত বয়সে তাঁহার বিদ্যার্জন ও ধনার্জন কোনটিই হয় নাই। তিনি সর্বদা মদ্যপানে মাতাল হইয়া মুখে যাহা ইচ্ছা তাহা বলিতেন। কেবল নেশাপানে উন্মত্ত ও মোহগ্রস্ত হইয়া সময় অতিবাহিত করিতেন। একদা সুরভী নামক একজন পশ্চেক বুদ্ধ গ্রামে পিণ্ডপাত্র হস্তে পিণ্ডাচরণ করিতে দেখিয়া মুনালী জনগণকে বলিলেন-“বন্ধুগণ, এই শ্রমণ পাত্র

হস্তে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিতেছে। সে নিজে কোন কাজ করেনা, কেবল অপরের অনুপানীয়ে দেহ পুষ্ট করিতেছে মাত্র। বনে জঙ্গলে থাকিয়া গোপনে পাপকর্ম করিতেছে। সে একান্ত মিথ্যাচার পরায়ন দুঃশীল। অপরের দান পাইবার আশায় নিজেকে শীলবানের ন্যায় দেখাইতেছে।” এইরূপে বোধিসত্ত্ব মুনালাীর প্রদৃষ্ট মনের বাচনিক পাপের ফলে লক্ষ কল্পকাল নিরয়যন্ত্রনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। নিরয়মুক্ত হইয়া মনুষ্য জন্ম লাভ করিলেও বারংবার দুর্নামের ভাগী হইয়াছিলেন। অন্তিম জন্মে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াও সুন্দরী পরিব্রাজিকার অপবাদ হইতে রক্ষা পায় নাই। সুতরাং পাপ চিত্তে মুখ নিঃসৃত বাচনিক পাপ অতি দুঃখ দায়ক। উপরিবর্ণিত অপবাদের বিষয় নিম্নে প্রদত্ত হইল-

মহাকারুণিক বুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথ পিণ্ডিকারামে অবস্থান সময়ে বুদ্ধের অনন্ত ঋদ্ধি ও অনন্তগুণরাশি প্রভাবে জটিল সন্ন্যাসী তীর্থঙ্করদের মান প্রতিপত্তি যশ ও লাভ সৎকারাদি সর্ববিষয়ে পরিহানি ঘটয়াছিল। সুতরাং বর্তমান পরিস্থিতির বিষয় পর্যালোচনা করিয়া তাহারা গোপনে এক পরামর্শ সভা আহ্বান করিল। সভায় আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে- “গৌতমের চরিত্রে কলংক আরোপ করিতে পারিলে, পূর্বের ন্যায় আমাদের মান প্রতিপত্তি লাভ-সৎকার বৃদ্ধি পাইবে এবং তৎসঙ্গে আমাদের পূর্বসুখ-শান্তি ফিরিয়া আসিবে, মনস্কামনাও পূর্ণ হইবে।”

ইহাতে সকলে একমত হইয়া সুন্দরী নাম্নী এক পরিব্রাজিকাকে ডাকিয়া আনিল। গৌতমকে পর্য্যদন্ত করিবার উপায় তাহাকে বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়া কার্য সম্পাদনে নিয়োজিত করিল। সুন্দরী তাহাদের পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করিল এবং সেইদিন সন্ধ্যার সময় লোকেরা দেখে মত জেতবন বিহারে যাইতেছে এমন ভান করিয়া অন্যত্র তীর্থিয়দের আশ্রমে রাত্রি যাপন করিয়া অতি প্রত্যাশে যেন জেতবন বিহার হইতেই আসিতেছে, তেমন অবস্থান সৃষ্টি করিল। এইরূপে ক্রমবশত পনেরদিন যাবত গমানগমন দর্শনে লোকেরা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল-“সুন্দরী তুমি কোথায় গিয়েছিল?” প্রত্যুত্তরে সে বলিত, “আমি জেতবন বিহারের গন্ধকুঠি প্রাসাদে গৌতমের সঙ্গে অবস্থানের জন্য গিয়েছিলাম। তাঁহার মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিয়া আসিতেছি।” এই মিথ্যা প্রচারণা করিয়া নগর শোভনী

সুন্দরী বুদ্ধের প্রতি জনগণের অশ্রদ্ধার সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিল। তীর্থঙ্কর সুন্দরী পরিব্রাজিকার কথিত বিষয় সর্বত্র প্রচার করিতে লাগিল। বিচার-বিবেকহীন জনগণ কেহ কেহ বিশ্বাস করিল। আর বুদ্ধকে যাহারা সম্যকভাবে অবগত আছেন সেই জ্ঞানীদের অন্তরে সুন্দরীর অমূলক অপবাদ মোটেই রেখাপাত করিতে পারিলনা।

মহান পারমী পুরিত মহাকাৰুণিক বুদ্ধ কৃত কর্ম বিপাক হইতে অব্যাহতি পান নাই। সুতরাং অকুশল কর্ম যাহাতে সম্পাদিত না হয় তৎপ্রতি সতর্কতাবলম্বন প্রত্যেকের একান্ত কর্তব্য। সুন্দরী পরিব্রাজিকার মিথ্যা দুর্নাম রটনা প্রসঙ্গে সর্বজ্ঞ বুদ্ধের বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইল-

(১) মুনালী নামাহং ধুত্তো পুবেব অঞাসু জাতিসু  
পচ্চেক বুদ্ধং সুরভিং অব্ভাচিক্খিং অদুসকং।

বাংলা : ভিক্ষুগণ! আমি অজ্ঞাত কুলশীল নীচ জাতি দরিদ্রের ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়া মুনালী নামক মদ্যপায়ী মাতাল, ধূর্ত হইয়াছিলাম। তখন আমি নির্দোষ সুরভি নামক পচ্চেক বুদ্ধকে দুঃশীল ও চরিত্রহীন বলিয়া মিথ্যা অপবাদ করিয়াছিলাম।

(২) তেন কস্ম বিপাকেন নিরয়ে সংসরিং চিরং  
বহু বস্স সহস্সানি দুকখং বেদেসি বেদনং

বাংলা : সেই পাপকর্মের ফলে (বাচনিক পাপের কারণে) আমি সুচিরকাল বহু সহস্র বৎসর ভীষন নরকানলে দগ্ধ হইয়া দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলাম।

(৩) তেন কস্ম বস্সেন ইধ পচ্চমকেভবে  
অব্ভক্খনং ময়া লদ্ধং সুন্দরী কাযকারনা।

বাংলা : সেই কর্মের অবসানে এই অন্তিম জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াও তীর্থঙ্কর প্ররোচনায় সুন্দরী দুঃশীলার কারণে আমাকে মিথ্যা প্রচারিত অপবাদ ভোগ করিতে হইয়াছে।

## চতুর্থ বিপাক

অতীতকালে বুদ্ধাঙ্কুর উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তখন ধনসম্পদ ও বিদ্যাবুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ এবং নানাগুণে বিভূষিত হইয়াছিলেন। জনগণ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা সম্পন্ন হইয়া তাঁহাকে পূজা-সৎকার করিতে লাগিল। একদা তিনি সংসারের অসারতা উপলব্ধি করিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন এবং সঙ্কিত চিত্তে অচিরে সংসার ত্যাগ করিয়া ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ধ্যান সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে না পারিয়া নগরের সন্নিহিতে ‘মহাবন’ নামক স্থানে এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। তথায় পাঁচশত শিষ্যকে তিনি বেদ বেদান্ত ইত্যাদি শিক্ষা দিতেন। সেই সময় হিমালয় হইতে আগত ধ্যান সাধনায় অভিজ্ঞান প্রাপ্ত জনৈক ঋষি সেই নগরে উপনীত হইলে তথাকার জনগণ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ন হইল এবং নানা প্রকার উপঢৌকন দিয়া তাঁহার পূজা-সৎকার করিতে লাগিল। ইহা দর্শন করিয়া বুদ্ধাঙ্কুরের অন্তরে ঈর্ষ্যা ও পরশ্রীকাতরতা ভাব উৎপন্ন হইল। অতঃপর তাঁর এক তরুণী শিষ্যকে প্ররোচিত করিয়া উক্ত ধ্যান লাভী ঋষির নিকট গমনাগমন ও আদর আপ্যায়নের এমন অবস্থার সৃষ্টি করিতে হইবে যাহা দর্শনে ঋষির পূজারীদের মনে সন্দেহের উদ্বেক হয়। ইহাতে তাহাদের অন্তরে অশ্রদ্ধার সৃষ্টি হইবে এবং তাহার অপবাদ প্রচার হইবে। বুদ্ধাঙ্কুর ব্রাহ্মণ ঋষি নিজেও ধ্যান লাভী ঋষির দুশ্চরিত্রের বিষয় মিথ্যা রচনা করিয়া জনসমাজে প্রচার করেন। নিজের শিষ্যগণকেও ঋষির দুর্গাম রটনার জন্য প্রেরণা দেন। এই পাপ কর্মের ফলে সুদীর্ঘকাল নরক দুঃখ ভোগ করেন। অপায় দুঃখ ভোগান্তে মনুষ্য জন্ম লাভ করিলেও পুনঃ পুনঃ স্ত্রী সংক্রান্ত ব্যাপারে অপবাদ ভোগ করিতে ইহ্যাছে। অন্তিম জন্মে সম্যক সম্বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াও পঞ্চশত শিষ্যসহ সুন্দরী পরিব্রাজিকার অমূলক দুর্গাম ভোগ করিতে ইহ্যাছে। এই বাচনিক পাপের ভয়াবহ দুঃখ দায়ক পরিণাম জানিয়া বাক্ সংযমে বাচনিক পাপ হইতে বিরত হওয়া উচিত। নিষ্কলঙ্ক বুদ্ধের প্রতি দুর্গাম প্রচারের বিষয় নিম্নরূপ। যথাঃ- তীর্থঙ্কর সুন্দরী পরিব্রাজিকাকে প্রভূত-অর্থ-উৎকোচ দানে সম্মত করাইয়া বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাবান দায়ক দায়িকাদের অন্তরে অশ্রদ্ধা সঞ্চার

করার মানসে সুন্দরীকে প্রতি রাত্রি বুদ্ধের নিকট প্রেরণ করিত। যাহাতে লোকেরা জানিতে পারে যে, সুন্দরীর সংশ্রবে বুদ্ধের শীলভ্রষ্ট হইয়াছে। তদুপরি মদ্যপায়ী মাতালগণকে স্বর্ণ-রৌপ্যাদি বহু মূল্যবান জিনিস প্রদানে বশ করিয়া সুন্দরীকে হত্যা করাইল। পাপীষ্টা সুন্দরী নিহত হবেনা কেন? পূতাত্মা পুণ্য পুরুষ বুদ্ধের প্রতি অমূলক মিথ্যা প্রচারণা পাপ কর্মেরই দারুণ বিপাক। তীর্থঙ্করের ষড়যন্ত্রে সুন্দরী নিহত হইল। তাহার শবদেহ জেতবন বিহারে যেখানে পূজার পুষ্প ঝাড়ের বাসীফুল ত্যাগ করে, সেই বাসীফুলের তলদেশে গোপনে লুকাইয়া রাখে। ষড়যন্ত্রকারীরা সুন্দরীর শবদেহ খুঁজিয়া পাইতেছে না- একথা কোশল রাজাকে জানাইল। মৃতদেহ তালাশ করিবার জন্য বহুলোক নিয়োজিত করা হইল। বহু সন্ধানের পর জেতবন বিহারের বাসী ফুলের তলে সুন্দরীর শবদেহ পাওয়া গেল। তীর্থঙ্করগণ সুন্দরীর শবদেহ খুঁজিয়া পাইতেছে না, এই কথা সর্বত্র প্রচার করিল। পরিশেষে পুনঃ শবদেহ পাওয়ার খবরও জন সমাজে প্রচার করিল। এবং যত্রতত্র প্রচার করিল যে, গৌতম সুন্দরীর রূপে মুগ্ধ ও প্রেমাসক্ত হইয়া শীলভ্রষ্ট হইয়াছে। এই ঘটনা প্রকাশের ভয়ে তাহারই শিষ্যের দ্বারা সুন্দরীকে হত্যা করাইয়া জেতবন বিহারভ্যন্তরে লুকাইয়া রাখিয়াছে। তীর্থঙ্করেরা ঘটনা বৃহৎ করার উদ্দেশ্যে সর্বত্র প্রচার করিতে লাগিল। কোন কোন অজ্ঞানি বুদ্ধ ও তাহার পবিত্র সংঘের প্রতি সন্দেহ পোষণ করিল। কিন্তু তীর্থঙ্করের দূরভিসন্ধি বেশী দিন গোপন রহিল না। কোশল মহারাজ সুন্দরী হত্যার আসামী ধরিবার জন্য ও শবদেহ তালাশ করিবার জন্য নানা রকমের সন্ধানি রাজপুরুষ নিয়োজিত করিলেন। ভগবান বুদ্ধের অনন্তগুণ ও অনন্ত ঋদ্ধির প্রভাবে দূষ্টি পরায়ন সুন্দরী হত্যাকারী মাতালগণ অচিরে রাজ পুত্রদের হাতে ধরা পড়িল।

তীর্থঙ্করগণ সুন্দরী হত্যার জন্য যে উৎকোচ প্রদান করিয়াছিল দুর্বৃত্তগণ সেই উৎকোচ ভাগ বন্টনের সময় ভাগের তারতম্য হওয়াতে বাদ বিতন্ডার সৃষ্টি হয়। পরিশেষে মারামারি আরম্ভ হইল।

রাজপুরুষেরা তাহাদের ঝগড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা সত্য কথাই প্রকাশ করিল। রাজ পুরুষেরা দুর্বৃত্তদের গ্রেপ্তার করিয়া রাজার নিকট

প্রেরণ করিল। তীর্থঙ্করগণ ঘুষ দিয়া সুন্দরী হত্যা নিয়োজিত করিয়াছে। তাহারাই সুন্দরীকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া সকলে একবাক্যে স্বীকার করে। কোশল রাজা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা রাজার নিকট সত্য কথাই প্রকাশ করিল। রাজ বিচারে সুন্দরীকে হত্যাকারীরা দণ্ডিত হইল। তীর্থীয় সন্ন্যাসীদের উপরকৃত দুষ্কর্মের যথোচিত দণ্ডের বিধান হইল।

দুষ্কৃতিকারী মাতালদের দ্বারা সুন্দরী হত্যা প্রমাণিত হওয়ায় শশিষ্যে তীর্থঙ্করদিগকে ধরিবার জন্য রাজা পরোয়ানা বাহির করিলেন। এই খবর তীর্থঙ্করেরা শ্রবণ করিয়া রাখাল পাঁচন হাতে বিতাড়িত গরুর পালের ন্যায় যে দিকে পারে সেদিকে পলায়নে তৎপর হইল। যাহারা ধরা পড়িল, তাহাদের কঠোর দণ্ড প্রদান করা হইল। তখন নেতৃস্থানীয় বিশিষ্ট সন্ন্যাসীরা বিলুপ্ত হইল। অর্থাৎ তীর্থঙ্কর সম্প্রদায় এক প্রকার ধ্বংস হইল। উপরিউক্ত দণ্ডাদেশ শ্রাবস্তীর সর্বত্র ভৈরী শব্দে প্রচারিত হইলে বুদ্ধ ও ভিক্ষু সংঘের প্রতি জনগণের সন্দেহ বিদূরিত হইল এবং প্রত্যেকের অন্তরে বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘের প্রতি পূর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধা প্রবলতর হইল। অপদানে স্বয়ং বুদ্ধভাষিত গাথায় বর্ণিত হইয়াছে-

- (১) ব্রাহ্মনো সুতবা আসিং অহং সঙ্কত পূজিতো  
মহাবনে পঞ্চসতে মন্তে বাচেসি মানবে।  
তথাগতো ইসিভীমো পঞ্চাভিঞা মহিদ্ধিকো  
তঞ্চাহং আগতং দিস্বা অম্মাচিক্খিং অদুসকং  
ততোহং অবচং সিম্মো কাম ভোগি অয়ং ইসি  
ময্হামি ভাসমানস্ অনুমোদিংসু মানবা,  
ততো মানবকা সঙ্কে ভিক্খমানং কূলে কূলে,  
মহাজনস্ অহংসু কামভোগি অয়ং ইসি,  
ময্হংপি ভাসমানস্ অনুমোদিংসু মানবা।  
তেন কস্ম বিপাকেন পঞ্চ ভিক্খু সত ইমে,  
অব্ভক্খানং লভুং সঙ্কে সুন্দরী কায়কারনাতি।

বাংলা : ভিক্ষুগণ! আমি অতীত কালে বহুশ্রুত গুণ সম্পন্ন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইয়া মহাবনে পঞ্চশত জন শিষ্যের সেবা পূজা লাভ করিয়া তাহাদিগকে বেদ-মন্ত্র শিক্ষা প্রদান করিতাম।

তথায় পঞ্চ অভিজ্ঞান লাভী, মহাঋদ্ধি সম্পন্ন এক পরক্ৰান্ত ঋষি আগমন করিল। আমি তাহার আগমন দর্শনে প্রদুষ্ট চিত্তে অশ্লীল বাক্যে তিরস্কার করিতে লাগিলাম। অতঃপর আমি শিষ্যগণকে বলিলাম- “ঋষি কামভোগী”। আমি যাহা বলিলাম শিষ্যগণ তাহা অনুমোদন করিল।

তৎপর পণ্ডিত ঋষির শিষ্য সমূহ গ্রামে প্রতি ঘরে ঘরে অনু ভিক্ষার জন্য যাইয়া জনগণকে বলে। “এই ঋষি কামভোগী।” আমার ভাষিত বাক্য শিষ্যগণ অনুমোদন করিয়াছিল। ইহ জন্মে বুদ্ধ হইয়াও পূর্বজন্মের পাপের ফল সুন্দরী পরিব্রাজিকার কারণে পাঁচশত ভিক্ষুশিষ্য সহ অপবাদ লাভ করিলাম।

-০-

### পঞ্চম বিপাক

অতীতকালে বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠী কুলে জন্ম ধারণ করিয়াছিল। তাঁহার অপর একজন ছোট বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিল। মাতা-পিতার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য সম্পত্তি ছোট বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে না দিয়ে সমস্ত নিজে ভোগ দখল করিবার মানসে ছোট ভাইকে হত্যা করিবার সংকল্প পোষণ করেন। সম্পদ ভীষণ অনর্থকর, প্রানান্ত দুঃখ দায়ক। বুদ্ধাঙ্কুর হইলেও তৃষ্ণা ও লোভের অত্যধিক বশীভূত ছিল। কনিষ্ঠ থাকিলে পিতৃসম্পত্তির সমভাগ দিতে হইবে। সে মরিলে তিনি একাই ভোগ করিবেন। এই দুরভিসন্ধি তাঁহার অন্তরে উদয় হওয়াতে কার্য সিদ্ধির জন্য বিবিধ উপায়ে ছোট ভ্রাতার মন ভুলাইতে লাগিল। খাওয়া-পরা, আদর-মমতার মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়াছে। একদিন ভুলাইয়া এক নির্জন বনে নিয়া যায় এবং এক ভারী শিলা খন্ড দিয়া ভাইয়ের মস্তকে অতর্কিতে আঘাত করিলেন। সম্পত্তির লোভ কিরূপ নৃশংস-নিষ্ঠুর এবং লোমহর্ষকর ব্যাপার। অর্থ অনর্থের মূল। ভ্রাতা প্রাণ রক্ষার্থে ভ্রাতার নিকট সকাতরে প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেও কণামাত্র ক্রক্ষেপ না করিয়া পুনঃ পুনঃ শিলাঘাতে হত্যা করিয়া শবদেহ পাহাড়ের গহ্বরে নিক্ষেপ করিল। তখন বোধিসত্ত্ব হলেও তাঁহাকে অতি ত্রুর বা নিষ্ঠুর বলা যায়।

### লোভের শোচনীয় পরিণাম

এই দুষ্কর্মের ফলে বুদ্ধাঙ্কুরকে বহু কল্প কাল নরক যন্ত্রনা ভোগ করিতে



হইয়াছিল। পরিশেষে সম্বুদ্ধত্ব জীবনে পূর্বকৃত নিবন্ধন দেবদত্ত কর্তৃক ‘বেভার’ পর্বত হইতে শিলা গড়াইয়া দেয়া আঘাতে অশেষ দুঃখ যন্ত্রনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। দেবদত্তের শিলা পতনের ফলশ্রুতি নিম্নরূপ :

গৃহী জীবনে দেবদত্ত সিদ্ধার্থ গৌতমের সম্বন্ধী। বুদ্ধের প্রতি দেবদত্তের জন্মান্তরের আক্ৰোশ ছিল। তজ্জন্য যে কোনদিন বুদ্ধকে প্রাণে বধ করিবার পরিকল্পনা তাঁহার অন্তরে সর্বদা জাগ্রত ছিল। একদা ভগবান বুদ্ধ ‘বেভার’ পর্বতে অবস্থান করিতেছিলেন। এই সময়ে বুদ্ধকে হত্যা করিবার সুযোগ করিয়া বেভার পর্বতের প্রতি উচ্চতর শিখর হইতে এক বৃহৎ শিলা খন্ড বুদ্ধকে লক্ষ্য করিয়া গড়াইয়া দিয়াছিল। সেই বৃহৎ শিলাখন্ড অন্য পাহাড়ের দ্বারা আবদ্ধ হওয়াতে উভয়ের সংঘর্ষে এক ক্ষুদ্র শিলাকনা নির্গত হইয়া বুদ্ধের পায়ের বৃদ্ধাপুষ্ঠে সজোরে আসিয়া পড়িল। এই আঘাতে এক বিন্দু রক্ত পাত হইল। ইহাতে দেবদত্তের অনন্তরিয় কর্মের সৃষ্টি হইল। ইহার পরিণাম ফল-দারুণ অর্থাৎ নরকের দুঃখ। অপরের প্রচেষ্টায় কখনও সম্যক সম্বুদ্ধের প্রাণপাত করা সম্ভব নহে। ইহা ধর্মত নিয়ম। সেই জন্য বুদ্ধ বলেছেন-

“অট্ঠানমেতং ভিক্ষবে অনবকাসো যং

পারুপক্কমেন তথাগতং জীবিত বোরোপেয্য”।

বাংলা : ভিক্ষুগণ, কাহারো প্রচেষ্টায় তথাগত বুদ্ধের জীবন পাত করিবে- সেই কারণ-সেই অবকাশ বিদ্যমান নাই।

অপদান গন্ত্বে বর্ণিত হইয়াছে-

(১) বেমাতু ভাতরং পূবেব ধন হেতু হানিং অহং

পক্খিপিং গিরি দুগ্গম্মিং সিলায়চ অপিসমিৎ।

বাংলা : পূর্বজন্মে ধন সম্পদের কারণে বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে আমি হত্যা করিয়া গিরিদুর্গে (গিরি গহ্বরে) প্রক্ষেপ করিয়াছিলাম এবং শিলাদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়াছিলাম।

(২) তেনকম্ম বিপাকেন দেবদত্তো সিলং খিপি

অঙ্গুট্ঠং পিসয়ি পাদে সম পাষাণ সঙ্খরোতি।

বাংলা : সেই কর্মফলে দেবদত্ত শিলা ক্ষেপন করিয়া। পাষাণ কণা আমার পায়ের অঙ্গুলীতে আঘাত করিয়া যন্ত্রনা সৃষ্টি করিয়াছিল।

## ষষ্ঠ বিপাক

অতীতকালে বোধিসত্ত্ব নাম-গোত্র বিহীন নীচ বংশে জন্ম ধারণ করিয়াছিলেন। বাল্যকালে ছেলেদের স্বাভাবিক রীতিনীতি অনুযায়ী রাস্তায় আমোদিত হইয়া খেলায় নিরত আছেন। এমন সময় একজন পঞ্চেক বুদ্ধকে পিন্ডাচরণ করিতে দেখিয়া কৌতুহল বশতঃ একখন্ড পাথর প্রত্যেক বুদ্ধের পাদদ্বয় লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিয়াছিল। নিক্ষিপ্ত প্রস্তর খন্ড পঞ্চক বুদ্ধের পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে পতিত হইয়া রক্ত নির্গত হইয়াছিল এবং বহু দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন। এই অকুশল কর্মের বিপাকে বোধিসত্ত্ব দীর্ঘদিন নরক যাতনা ভোগ করিয়াছিলেন এবং অপায়মুক্ত হইয়া মনুষ্য জন্ম লাভ করিলে অনেক ক্ষেত্রে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও কর্ম বিপাক ভোগ করিতে হইয়াছে। পরিশেষে অন্তিম জন্মে ‘বেভার’ পর্বত হইতে দেবদত্তের নিক্ষিপ্ত বৃহৎ শিলা খন্ডের কণা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে সজোরে আসিয়া আঘাত লাগাতে এক বিন্দু রক্ত পাত হইয়াছিল। ইহাতে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে। তাহাও পূর্বজন্মার্জিত কর্মের ফল। অপদান গ্রন্থের বর্ণনায় আছে যথা :-

- (১) পৃষ্ণেহং দারকো হুত্বা কিলমানো মহাপথে,  
পঞ্চেক বুদ্ধং দিস্থান মগ্নে সঞ্জালিকং থিপিং
- (২) তেন কস্ম বিপাকেন ইধ পচ্চিমকে ভবে,  
বধথং মং দেবদত্তো অভিমারে পয়োজয়িং।

(১) ভিক্ষুগণ, পূর্বজন্মে আমি বালক অবস্থায় রাস্তায় খেলা করিবার সময় একজন পঞ্চেক বুদ্ধকে সেই পথে আসিতে দেখিয়া মৃত্তিকাপত্রের ভগ্নাংশ নিক্ষেপ করিয়াছিলাম।

(২) সেই কর্ম বিপাকে দীর্ঘদিন ধরে ইহ জন্মে আমাকে হত্যার জন্য দেবদত্ত হত্যাকারী নিয়োগ করিয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে অবগতির জন্য দেবদত্ত যে বুদ্ধকে হত্যা করিবার জন্য হত্যাকারী নিয়োগ করিয়াছিল, সেই বিষয় জাতক অর্থকথা হইতে

সংগ্রহ করিয়া সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণিত হইলঃ

শাস্তা গৃধ্রকূটে অবস্থান কালে দেবদত্ত সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন- রাজা বিম্বিসারের প্রাণবধ করাইয়া দেবদত্ত অজাতশত্রুর নিকট গিয়া বলিল- “মহারাজ আপনার মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে। আমার মনোরথ এখনও পূর্ণ হয় নাই-”। অজাতশত্রু জিজ্ঞাসা করিলেন- “ভদত্ত আপনার মনোরথ কি?” “আমি দশ বলকে বধ করাইয়া স্বয়ং বুদ্ধ হইব।” “ইহার জন্য আমাকে কি করিতে হইবে?” “আপনি কতকগুলি তীরন্দাজ সমবেত করুন।” “বেশ! তাহাই করিতেছি।” অতঃপর অজাতশত্রু পঞ্চশত তীরন্দাজ সমবেত করাইলেন।

দেবদত্ত তাহাদের মধ্যে হইতে একত্রিশ জন বাছিয়া লইলেন। তাহাদিগকে বলিলেন, “তোমরা দেবদত্তের নিকট যাও, তিনি যাহা আদেশ করেন, তাহা প্রতিপালন করিবে।” দেবদত্ত এই একত্রিশ জনের প্রধানকে সম্বোধন করিয়া বলিল, “শুন বাপু, শ্রমণ গৌতম গৃধ্রকূটে অবস্থান করেন। তিনি প্রতিদিন অমুক সময়ে দিবা বিহার স্থানে চংক্রমণ করেন। তুমি সেখানে গিয়া বিষদণ্ড শরে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার প্রাণান্ত করিবে এবং অমুক পথে প্রত্যাবর্তন করিবে।” ইহা বলিয়া ঐ লোকটাকে পাঠাইয়া দিল এবং যে পথে তাঁহার প্রত্যাবর্তনের কথা সেই পথে দুইজন তীরন্দাজ স্থাপন করিয়া তাহা দিগকে বলিয়াছিল, “তোমরা যে পথে থাকিবে সে পথে একজন লোক আসিতে দেখিবে। তাহাকে বধ করিয়া তোমরা অমুক পথে প্রত্যাবর্তন করিবে। উক্ত পথে চারিজন তীরন্দাজ রাখিল এবং তাহাদিগকেও বলিয়া দিল “তোমরা যে পথে থাকিবে সে পথে দুজন লোক আসিতে দেখিবে তোমরা তাহাদিগকে বধ করিয়া অমুক পথে ফিরিবে। ইহাদের যে পথে ফিরিবার কথা সেই পথে আটজন তীরন্দাজ পাঠাইল এবং তাহাদিগকেও বলিয়া দিল তোমরা যে পথে থাকিবে সে পথে দেখিতে পাইবে চারিজন লোক আসিতেছে। তোমরা তাহাদিগকে বধ করিয়া অমুক পথে প্রত্যাবর্তন করিবে। পরিশেষে সে শেষোক্ত পথে ষোলজন তীরন্দাজ স্থাপন করিল এবং তাহাদিগকেও বলিয়া দিল তোমরা যে পথে থাকিবে সে পথে দেখিতে পাইবে আটজন লোক আসিতেছে। তোমরা তাহাদিগকেও বধ করিয়া অমুক পথে প্রত্যাবর্তন করিবে। দেবদত্ত এইরূপ ব্যবস্থা করা একমাত্র কারণ-

আত্ম দুষ্কৃতি গোপনের জন্য । তীরন্দাজগণের নেতা বাম পার্শ্বে খড়গ এবং পৃষ্ঠে তুণীর বন্ধন করিল এবং মেঘ শৃঙ্গ নির্মিত কার্মুক লইয়া তথাগতের নিকট গমন করিল । তাঁহাকে বিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে সে কার্মুক সজ্জা করিয়া তাহাতে শরসন্ধান করিল । কিন্তু জ্যা আকর্ষণ করিয়াও তীর নিক্ষেপ করিতে পারিল না । তাহার সর্বাঙ্গ স্তম্ভিত হইল, যেন তাহার দেহখানি যন্ত্রে নিষ্পেষিত হইয়াছে । এইরূপ বোধ করিতে লাগিল যে, মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল । তাহাকে দেখিয়া শাস্তা মধুর স্বরে বলিলেন “ভয় নাই, এখানে আস ।” তখনই লোকটা অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করিয়া শাস্তার পাদমূলে নিপতিত হইল এবং বলিতে লাগিল- “ভগবান আমি পাপ বশে বালকের ন্যায়, মূঢ়ের ন্যায় দুষ্কর্মে নিযুক্ত হইয়াছি । আমি আপনার মহিমা জানিতাম না । অজ্ঞানন্ধ দুর্মতি দেবদত্তের কথা শুনিয়া আপনার প্রাণান্ত করিবার জন্য আসিয়াছিলাম আপনি আমাকে ক্ষমা করুন । শাস্তা তাহাকে ক্ষমা করিলে সে একান্তে উপবেশন করিল । শাস্তা তাহাকে বলিলেন- “ভদ্রে দেবদত্ত তোমাকে যে পথে প্রত্যাবর্তন করিতে বলিয়াছে, তাহা পরিহার করিয়া তুমি অন্য পথে যাইবে ।”

শাস্তা তাহাকে বিদায় দিয়া চংক্রমণ হইতে অবতরণ পূর্বক একটা বৃক্ষের মূলে উপবিষ্ট হইলেন । এদিকে ঐ ধনুর্ধর ফিরিতেছে না দেখিয়া যে দুজন প্রথম আদিষ্ট হইয়াছিল তাহারা ভাবিল- “এই লোকটা আসিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন?” এই মনে করিয়া তাহারা ঐ পথে আরো অগ্রসর হইয়া শাস্তাকে দেখিতে পাইল এবং তাহার নিকট গিয়া নমস্কার করিয়া একান্তে উপবেশন করিল । শাস্তা তাহাদিগকে সত্য সমূহ ব্যাখ্যা করিয়া স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন এবং বিদায় দিবার কালে বলিলেন- “দেবদত্ত তোমাদিগকে যে পথে ফিরিতে বলিয়াছে, তোমরা তাহা পরিহার করিয়া অন্য পথে যাইও ।”

অন্য যাহারা শাস্তার নিকট উপস্থিত হইল, তাহারাও এই রূপে সত্য ব্যাখ্যা শুনিয়া স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিল এবং অন্যপথে গমন করিতে আদেশ করিলেন ।

প্রথমে যে তীরন্দাজ গিয়াছিল সে দেবদত্তের নিকট গিয়া বলিল, “ভদত্ত দেবদত্ত আমি সম্যক সম্বুদ্ধের জীবনান্ত করিতে অসমর্থ হইয়াছি । সেই ভগবান

মহানুভব মহাঋদ্ধিবান । অন্য সকলেও দেখিল সম্যক সম্বুদ্ধের কৃপাতে তাহাদের প্রাণ রক্ষা হইয়াছে । এই নিমিত্ত এই একত্রিশ জন তীরন্দাজ ধনুর্ধর শাস্তার নিকটে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিল এবং অচিরে অর্হৎ প্রাপ্ত হইল । ক্রমে ভিক্ষুরা এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন । তাঁহারা ধর্ম সভায় সমবেত হইয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন শুনিলে ভাই, দেবদত্ত এক তথাগতকে হত্যার ইচ্ছা করিয়া বহু লোকের প্রাণ বধের চেষ্টা করিয়াছিল । কিন্তু, শাস্তার কৃপায় সেই সকল লোকের প্রাণ রক্ষা হইয়াছে । সে সময় শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন- “ভিক্ষুগণ কেবল এখন নহে পূর্বেও দেবদত্ত আমার প্রতি শত্রুতা পোষণ করিয়া বহু লোকের প্রাণ নাশের চেষ্টা করিয়াছিল ।”

(মহাপদ্ম জাতক দ্রষ্টব্য)

-০-

## সপ্তম বিপাক

অতীতে পুরাকালে বোধিসত্ত্ব বারানসী রাজার হস্তীর মাহুত হইয়াছিলেন । সমস্ত রাজ হস্তীর রক্ষণাবেক্ষণ পরিচর্যা ও প্রতিপালন যাবতীয় কার্য তাঁহাকে সম্পাদন করিতে হইত । হস্তীর রক্ষক বুদ্ধাঙ্কুর একদিন হস্তী আরোহনে নগর ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন । এমন সময় একজন পশ্চেক বুদ্ধ ক্রমে ভিক্ষাচর্যা করিয়া আসিতে আসিতে বোধিসত্ত্বের হস্তীর সম্মুখীন হইল । তখন মাহুত হাতীকে অন্ধুশাখাতে পশ্চেক বুদ্ধের দিকে ধাবিত করিয়া বলিল, “মুন্ডক শ্রমণ, কোথা হইতে আসিতেছ? সরিয়া যাও । নচেৎ তোমাকে হস্তীর দ্বারা আক্রমণ করাইব ।” অহংকারে গর্বিত বোধিসত্ত্ব এইরূপ সাবধান করিলেও পশ্চেক বুদ্ধ স্থীয় সংযত ইন্দ্রিয়ের কোনরূপ ব্যতিক্রম না করিয়া স্বাভাবিক নিয়মে ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছিলেন । অহংকারে মত্ত বুদ্ধাঙ্কুর কর্কশ স্বরে বলিল, “মুন্ডিত মস্তক শ্রমণ, আমার কথা অগ্রাহ্য করিলে?” এইরূপ আক্রোশ বাক্য বলিয়া হাতীকে অন্ধুশের দ্বারা তাড়াইয়া পশ্চেক বুদ্ধকে আক্রমণে প্রয়াসী হইল । ইত্যবসরে পশ্চেক বুদ্ধ ধ্যানস্থ হইয়া অতিদ্রুত আকাশ পথে, উত্তীর্ণ হইলেন ।

সুতরাং হাতীর আক্রমণ হইতে মুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু আকাশের দিকে অগ্রসর হইবার সময় পারুপন করা চীবর নিচের দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। নিম্নে ঝুলান চীবর হাতীর শূর দ্বারা টানিয়া নিয়া পায়ে মাড়াইয়া ছিন্ন ভিন্ন টুকরা টুকরা করিয়া ছিড়িয়া ফেলিল। বোধিসত্ত্বের এই হীন মনোভাব অত্যন্ত জঘন্য নয় কি? এই নীচ প্রবৃত্তির দরুণ তাহার অকুশল কর্ম বিপাকে সর্ব্বজ্ঞত বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া সর্ব্ব দুঃখ মুক্ত নির্বাণ প্রবেশের প্রাক্কালে অন্তিম জন্মে দুর্দান্ত নালাগিরি হস্তীর আক্রমণ জনিত অতীত কর্ম বিপাক ভোগ করিতে হইয়াছে।

নালাগিরি হস্তী আক্রমণের বিষয় নিম্নে বর্ণিত হইল :-

দেবদত্ত বুদ্ধকে হত্যার পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিলেও একবারও সফলকাম হইতে পারেন নাই। পরিশেষে রাজা অজাতশত্রুর সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করিয়া বলিল- “মহারাজ, আপনি পিতাকে হত্যা করিয়া রাজা হউন। আমি বুদ্ধকে মারিয়া বুদ্ধ হইব”। এই পরামর্শে উভয়ে একমত হইয়া একদিন রাজার আদেশে হস্তী শালায় গিয়া হস্তীর প্রধান মাহুতকে বলিল, “আগামীকাল নালাগিরিকে ষোল কলসী সুরা পান করাইয়া বুদ্ধ ও তাঁহার শিষ্যগণ পিণ্ডাচরণের সময় প্রেরণ করিবে” বলিয়া নির্দেশ দেয়। সকল নগরে মহা কোলাহলের সৃষ্টি হইল। বুদ্ধের সহিত নালাগিরি হস্তীর ভীষণ যুদ্ধ হইবে এবং খবর সর্বত্র প্রচারিত হইল। রাজ পথের উভয় পার্শ্বে মঞ্চের পর মঞ্চ প্রস্তুত হইল। প্রাতঃকাল হইতে অগণিত দর্শকের সমাগম হইল। বুদ্ধও প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্বক ভিক্ষু সংঘ সমভিব্যাহারে রাজগৃহে পিণ্ডাচরণে প্রবেশ করিলেন। সেইক্ষণে পূর্বের কথানুসারে নালাগিরিকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। হস্তী মদের নেশায় উন্মত্ত হইয়া রাজপথে অগ্রসর হইল। তখন একটি স্ত্রীলোক একটি ছেলে হাতে ধরিয়া রাস্তা ত্যাগ করিয়া অন্যদিকে যাইতেছিল। হস্তী সেই স্ত্রীলোককে দর্শনে তাহার দিকে ধাবিত হইল। তখন ভগবান বলিলেন- “নালাগিরি ঐ নারীকে হত্যার জন্য তোমাকে পাঠায় নাই। আমার দিকে আস। নালাগিরি এই শব্দ শুনিয়া বুদ্ধের দিকে ধাবিত হইল। তখন ভগবান অনন্ত চক্রবালের প্রতি অপ্রমেয় মৈত্রী বর্ষণ করিতেছিলেন এখন শুধু সেই অপার মৈত্রী কেবল নালাগিরি হস্তীর প্রতি বর্ষিত হইল। বুদ্ধের অসীম মৈত্রী প্রভাবে মৈত্রী সম্পর্শে

হস্তিও তখন মৈত্রী স্নাত অন্তরে ভগবানের পাদমূলে নিপতিত হইল। ভগবান নালাগিরির মস্তকে হাত বুলাইলেন এবং আশির্বাদ করিলেন “সুখী হও।” এই অদম্য নালাগিরি দমন বুদ্ধের অপার মৈত্রী বলে বুদ্ধের এই জয়ের বিষয় বৌদ্ধ জগতে প্রত্যেকেই জানেন। অপদান গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে-

(১) হথা রোহ পূবে আসি পক্ষেক মুনিং মুত্তমং  
পিভায় বিচরন্তং তং আমা গজেনাং

(২) তেনকম্ম বিপাকেন ভতো নালগিরি গজো  
গিরিব্বজে পূরবরে দারুনো সমুপাগামীতি।

বাংলা : (১) ভিক্ষুগণ, আমি পূর্বজন্মে মাহুত ছিলাম। মুনি শ্রেষ্ঠ পক্ষেক বুদ্ধ অনু ভিক্ষার জন্য বিচরণ করিবার সময় হস্তী দ্বারা আমি তাঁহাকে আক্রমণ করাইয়া ছিলাম।

(২) সেই কর্ম বিপাকে উন্মত্ত-বিভ্রান্ত নালাগিরি নামক হস্তী গিরিব্রজে দারুণভাবে আমার সম্মুখে উপাগত হইয়াছিল।

দ্রষ্টব্য : বুদ্ধের অতীত মৈত্রী প্রভাবে নালাগিরি দমিত হইয়াছে দেখিয়া অসংখ্য জনগণ ও দেবদত্ত প্রভৃতি সকলেই বুদ্ধের অনন্তগুণে আশ্চর্যান্বিত হইল। মহাজনসংঘ নালাগিরিকে পুষ্পরাশি দ্বারা সজ্জিত করিল এবং অর্থ ও স্বর্ণ রৌপ্যাদি বহুমূল্য সম্পদ দিয়া সংবর্ধনা জানাইলেন। তখন হইতে নালাগিরি হস্তী ধনপাল নামে অভিহিত হয়। পশ্চিম রাজদ্বারে প্রদত্ত ধন জনসাধারণ প্রজাগণের হউক এবং পূর্বদ্বারের ধন রাজভান্ডারে জমা হউক বলিয়া ভেরী চরাইয়া ঘোষণা করা হইল।

## অষ্টম বিপাক

অতীতে বহুকল্প পূর্বে বোধিসত্ত্ব প্রদেশ রাজা হইয়া জন্ম ধারণ করিয়াছিলেন। অসৎসঙ্গ সমাগমে সর্বদা মদ্যপান করিয়া সঙ্গীদের সাথে আমোদ প্রমোদে দিন কাটাইবেন। একদা প্রদেশরাজ বুদ্ধাঙ্কুর অতিরিক্ত মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া একজন অসহায় নির্দোষ লোককে অস্ত্রাঘাতে নিগ্রহ করিতে করিতে পরিশেষে তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে অসহ্য যন্ত্রণায় লোকটি প্রাণ ত্যাগ করে।

এই অকুশল কর্ম বিপাকে তাঁহাকে বহুকল্প নরক যন্ত্রণায় ভোগ করিতে হইয়াছে। পরিশেষে লক্ষাধিক চারি অসংখ্য কল্প মহাদুষ্করণীয় কর্ম সম্পাদন পূর্বক পারমী পূর্ণ করার পর বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াও পূর্ব কৃত কর্ম হইতে রক্ষা পান নাই। বুদ্ধকে হত্যার পরিকল্পনায় দেবদত্ত কর্তৃক ‘বেভার’ পর্বত হইতে নিপাতিত শিলজাত শিলকণার আঘাতে বুদ্ধের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে রক্ত জমাট হইয়াছিল। সেই শিলাঘাত জাত রোগ সহজে আরোগ্য না হওয়ায় জমাট রক্ত নির্গমনের জন্য বৈদ্যরাজ জীবক কর্তৃক অস্ত্রোপচারের অসহ্য যন্ত্রণা তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল। বৈদ্যরাজ জীবক বুদ্ধের দুঃখ যন্ত্রণা মোচনের চেষ্টনায় অস্ত্রোপচার করিলেও পুণ্যচেতনা বশে পাপ গ্রন্থ না হইয়া বরং পুণ্যার্জন করিয়াছেন। শ্রদ্ধা প্রণোদিত পুণ্যচেতনাই কৃত কর্মের প্রকৃষ্ট উদাহরণ :

(১) রাজাহং পতিকো আসিং সখিনা পুরসিং হনিং  
তেন কস্ম বিপাকেন নিরয়ে পচ্চিসংভুসং।

বাংলা : অতীতকালে পূর্বজন্মে এক সময় আমি প্রতিপত্তি সম্পন্ন রাজা হইয়াছিলাম। অস্ত্রাঘাতে একজন লোককে আমি হত্যা করিয়াছিলাম। সেই কর্মবিপাকে নরকে আমি তীব্রভাবে দগ্ধ হইয়াছিলাম।

(২) কস্মুনা তস্স সেসেন ইদানীং সকলং মম  
পাদে ছবিং পকল্লেসি নহি কস্মং বিনস্‌সতি।

বাংলা : পরিশেষে আমার সেই কর্মে এই জন্মে পায়ের চর্ম কতন করিতে হইয়াছে। কর্ম কিছুতেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়না।



## নবম বিপাক

অতীত কালে বোধিসত্ত্ব কোন এক কৈবর্ত গ্রামে কৈবর্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক দিন তিনি স্বজাতিদের সঙ্গে মৎস্য মারিবার স্থানে গিয়াছিলেন। তথায় আত্মীয়গণ আনন্দ মনে মৎস্য হত্যা করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া তিনিও আনন্দ প্রীতি অনুভব করিয়াছিলেন। এই অকুশল কর্ম বিপাকে চারি অপায়ে জন্ম গ্রহণ করিয়া বহু দুঃখ ভোগের পর অন্তিম জন্মে পূর্বের জ্ঞাতী গণ সহ শাক্যরাজকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। তিনি সংসার ত্যাগের পর ছয় বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়াও বুদ্ধত্ব জ্ঞান লাভ করিতে পারিলেন না। অনাহারে অনিদ্রায় অস্থিচর্মসার হইলেন মাত্র। এবার তিনি কঠোর তপস্যা ত্যাগ করিয়া মধ্যম প্রতিপদা অবলম্বন করিলেন। ভিক্ষালব্ধ অনু পরিভোগ করিতে লাগিলেন। অনুক্রমে তিনি সবলতা লাভ করিয়া বোধিমূলে অন্তিম জ্ঞানের অধিকারী হইলেন।

### শাক্যবংশ ধ্বংসের কারণ

শ্রাবস্তী নগরে অনাথপিণ্ডিকের গৃহে নিয়মিত পঞ্চাশত ভিক্ষুর ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। বিশাখার এবং কোশল রাজার ভবনেও এইরূপ দানের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু রাজ ভবনে নানারূপ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত ভোজ্য প্রদত্ত হইলেও পরিবেশন কারীরা ভিক্ষুদিগকে প্রীতির চোখে দেখিত না। সেই জন্য ভিক্ষুরা রাজভবনে বসিয়া আহার করিতেন না। সেখান হইতে ভোজ্যবস্তু গ্রহণ করিয়া অনাথ পিণ্ডিক বিশাখা অথবা অন্য কোন শ্রদ্ধাবান উপাসকের গৃহে গিয়া ভোজন করিতেন। একদিন রাজার নিকট বহু ভোজ্য উপহার আসিয়াছিল। তিনি উহা ভিক্ষুদিগকে দিবার জন্য ভোজনালয়ে প্রেরণ করিলেন। ভৃত্যেরা আসিয়া বলিল,- “দেব! ভোজনালয়ে কোন ভিক্ষু নাই।” “তাহারা কোথায় গেলেন?” “তাহাদের প্রিয় উপাসকের গৃহে বসিয়া ভোজন করেন।” ইহা শুনিয়া রাজা প্রাতঃরাশ গ্রহণান্তে শাস্তার নিকট গিয়া বলিলেন- “ভগ্নে ভগবান! উৎকৃষ্ট ভোজন কাহাকে বলে?” শাস্তা বলিলেন- প্রীতি সহকারে প্রদত্ত ভোজনই উৎকৃষ্ট। দায়ক যদি প্রীতির সহিত কিঞ্চিৎ দান করে তাহাও মধুর হয়।” “ভদন্ত!

কিরূপ লোকের সহিত ভিক্ষুদের প্রীতি জন্মে?” “হয় স্ব-স্ব জ্ঞাতীগণের সহিত নয় শাক্য কুলের সহিত।” তখন রাজা ভাবিলেন “আমি একটি শাক্য কন্যা আনিয়া তাহাকে অগ্রমহিষী করিব।” তাহা করিলে ভিক্ষুরা আমাকে জ্ঞাতিসদৃশ মনে করিয়া আমার প্রতি প্রীতিমান হইবেন।”

অনন্তর তিনি উঠিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। অতঃপর দূত মুখে কপিলবস্তুতে সংবাদ পাঠাইলেন। আপনারা আমাকে একটি কন্যা দান করুন। আমি আপনাদের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা করি। দূতদিগের কথা শুনিয়া শাক্য গণ সমবেত হইয়া মন্ত্ৰণা করিতে লাগিলেন। তাহারা বলিলেন, “আমরা কোশল রাজার আজ্ঞাধীন স্থানে বাস করি। যদি তাহাকে কন্যা দান না করি তাহা হইলে তিনি আমাদের প্রতি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইবেন। দান করিলেও আমাদের কুলাচার নষ্ট হইবে। এ অবস্থায় কর্তব্য কি?” ইহা শুনিয়া মহানাম-নামক শাক্য উত্তর করিলেন,- “কোন চিন্তা নাই আমার কন্যা বাসব ক্ষত্রিয়া নাগমুন্ডা নাম্নী দাসীর গর্ভে জন্মিয়াছে। তাহার বয়স এখনও ষোল বৎসর। সে পরমা সুন্দরী, সুলক্ষণা এবং পিতৃপক্ষে ক্ষত্রিয়া। তাহাকেই ক্ষত্রিয় কন্যা বলিয়া প্রসেনজিতের নিকটে প্রেরণ করিব।” ইহা অতি উত্তম প্রস্তাব বলিয়া সকল শাক্যই ইহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন এবং দূতদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন- “আমরা কন্যা দান করিতেছি, আপনারা এখনই তাহাকে লইয়া যাত্রা করিতে পারেন।” দূতেরা বলিলেন- “এই শাক্যেরা জাতি সম্বন্ধে অত্যন্ত অভিমানি। যে ইহাদের কুলজাত নহেন এমন কন্যাকেও হয়ত আত্মকুলজাত বলিয়া দান করিতে পারেন। অতঃপর ইহাদের সঙ্গে একাসনে বসিয়া আহার করে এমন কন্যাই গ্রহণ করিবে।” শাক্যগণ বলিলেন- “তাহাই হইবে। আমরা কন্যা গ্রহণ করিয়া যাইতেছি, কিন্তু যিনি আপনাদের সহিত একাসনে আহার করেন এমন কন্যা গ্রহণ করিব।” শাক্যগণ দূতদিগের বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন এবং কি করিবেন, আবার তাহা মন্ত্ৰণা করিতে লাগিল। মহানাম বলিলেন- “তোমরা চিন্তা করিওনা। আমি ইহার উপায় ঠিক করিয়া দিতেছি।” তিনি বলিলেন- “আমি যখন আহার করিতে বসিব তখন তোমরা বাসব ক্ষত্রিয়াকে অলংকার পরাইয়া আমার নিকট আনিবে। এবং আমি একগ্রাস মুখে দিবমাত্র একখানা পত্র দেখাইয়া বলিবে “দেব! অমুক রাজা আপনার জন্য পত্র

পাঠাইয়াছেন। তিনি কি বলিতেছেন অনুগ্রহ পূর্বক এখনই তাহা শুনিতে আজ্ঞা হয়”। সকলে এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। অতঃপর মহানাম যখন ভোজনে বসিলেন তখন তাহারা কুমারীকে অলংকার পরাইলেন। মহানাম বলিলেন- “আমার মেয়েকে আন। সে আমার সঙ্গে আহার করুক।” তাহারা বলিলেন- “সে অলংকার পরিলেই আসিবেন। অনন্তর একটু বিলম্ব করিয়া তাহারা কুমারীকে মহানামের নিকট লইয়া গেল। সে বাবার সঙ্গে খাবে বলিয়া সেই ভোজন পাত্রে হাত দিলেন তখন মহানাম তাঁহার সঙ্গে একথাস তুলিয়া মুখে দিলেন এবং যেমন দ্বিতীয় গ্রাস গ্রহণের জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন, অমনি কয়েকজন ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে একখানা পত্র ধরিয়া বলিল- “দেব! অমুক রাজা পত্র পাঠাইয়াছেন। তিনি কি লিখিয়াছেন শুনিতে আজ্ঞা হউক। তখন মহানাম হাত তুলিলেন এবং মেয়েকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “মা, তুমি খাও বলিয়া মহানাম দক্ষিণ হস্তখানি পাত্রে রাখিয়াই বাম হস্তে পত্রখানি লইলেন এবং উহা পড়িতে লাগিলেন।” এদিকে বাসব ক্ষত্রিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভোজন শেষ হইলে মহানাম হস্ত ও মুখ প্রক্ষালণ করিলেন। দূতেরা ভিতরের ব্যাপারে জানিতে পারিলেন না। তাঁহাদের একান্তই বিশ্বাস জন্মিল যে, বাসব ক্ষত্রিয়া বাস্তবিক মহানামের কন্যা।

সুতরাং মহানাম কন্যাকে মহাসমারোহে প্রেরণ করিলেন। দূতগণ বাসব ক্ষত্রিয়াকে কোশলের রাজধানীতে নিয়া গিয়া রাজাকে বলিলেন-এই কুমারী সৎকুলজাতা। ইনি মহানামেরই কন্যা। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া সমস্ত নগর সুসজ্জিত করাইলেন এবং বাসব ক্ষত্রিয়াকে রত্নারাশির মধ্যে বসাইয়া অগ্রমহিষীর পদে অভিষিক্ত করিলেন। বাসব ক্ষত্রিয়া রাজার প্রিয়া ও চিত্তবিনোদনী হইলেন। অচিরে তাঁহার গর্ভ সঞ্চারণ হইল। গর্ভ রক্ষার্থে যা যা আবশ্যক রাজার আদেশে সমস্ত সম্পাদিত হইল। বাসব ক্ষত্রিয়া দশমাস পরে এক সুবর্ণ বর্ণ পুত্র প্রসব করিলেন। এই কুমারের নামকরণ দিবসে রাজা নিজের পিতামহীর নিকট লোক পাঠাইয়া জিজ্ঞাসিলেন “শাক্যরাজ কন্যা বাসবক্ষত্রিয়া একটি পুত্র প্রসব করিয়াছেন। ইহার কি নাম রাখা হইবে?” যে অমাত্য এই কথা জানিবার জন্য গিয়াছিলেন, তিনি একটু বধির ছিলেন। রাজ পিতামহী তাহার কথা শুনিয়া বলিলেন- “বাসব ক্ষত্রিয়ার যখন পুত্র হয় নাই, তখনই তিনি সবার উপর প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। এখন তিনি রাজার আরও বল্লভী হইলেন।”

বধির অমাত্য ‘বল্লভী’ শব্দটি ভালরূপে শুনিলেন না। তিনি ভাবিলেন রাজ পিতামহী বুঝি “বিড়ুড়ভ” এই নামই উচ্চারণ করিয়াছেন। অতএব, তিনি রাজার নিকট গিয়া বলিলেন- “মহারাজ, কুমারের বিড়ুড়ভ এই নামই রাখুন”। রাজা ভাবিলেন-ইহা বোধ হয় তাহার কুলদত্ত কোন প্রাচীন নাম হইবে। অতএব কুমারের বিড়ুড়ভ এই নামই রাখা হইল।

অতঃপর কুমার রাজপদোচিত আদর যত্নের সহিত লালিত পালিত হইতে লাগিলেন। তাহার যখন বয়স সাত বৎসর তখন অন্যান্য রাজ পুত্রদের মাতামহ কুল হইতে হস্তী, অশ্ব ইত্যাদি ক্রীড়ানক উপহার স্বরূপ আসিতে দেখিয়া তিনি একদিন বাসব ক্ষত্রিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা, অন্যের মাতামহলয় হইতে কত উপহার আসিয়া থাকে। কিন্তু আমার জন্যত কেহ কিছু পাঠায়না। তোমার কি মাতা-পিতা নাই? বাসব ক্ষত্রিয়া বলিলেন,-“বৎস মাতামহ বংশ শাক্যদিগের রাজা। তাঁহারা অনেক দূরে থাকেন বলিয়া কিছু পাঠাইতে পারেন না।” ইহার পর বিড়ুড়ভের বয়স যখন ষোল বৎসর হইল তখন তিনি একদিন তাঁহার মাতাকে বলিলেন-“মা, আমার একবার মামার বাড়ী দেখিতে ইচ্ছা হয়।” বাসব ক্ষত্রিয়া বলিলেন- “না, বৎস সেখানে গিয়ে কি করিবে?” কিন্তু তিনি নিষেধ করিলেও পুত্র পুনঃ পুনঃ মামার বাড়ীর বায়না ধরিতে লাগিলেন। তখন বাসব ক্ষত্রিয়া অগত্যা কুমারকে যাইবার সম্মতি দিলেন এবং বলিলেন-“তবে যাও”।

তখন বিড়ুড়ভ পিতার অনুমতি লইয়া মহাসমারোহে মাতুলালয়ের দিকে যাত্রা করিলেন। বাসব ক্ষত্রিয়া পত্র দ্বারা পিতা মহানামকে অগ্রেই জানাইলেন- “আমি এখানে বাবা বেশ সুখে আছি। আমার গুরুজন যেন আমার ছেলেকে কোন গুপ্ত কথা না বলেন।” বিড়ুড়ভের আগমন সংবাদ পাইয়া শাক্যগণ অল্প বয়স্ক কুমার দিগকে জনপদে পাঠাইয়া দিলেন। কেননা শাক্য বংশীয় কেহই তাহাকে প্রণাম করিবেন না।

এদিকে বিড়ুড়ভ কপিল বস্তুতে পৌঁছিলেন। তাহার অভ্যর্থনার জন্য শাক্যগণ সম্ভাগারে সমবেত হইলেন। তাহার পরিচয় দিতেছেন-” ইনি আপনার মাতামহ, ইনি আপনার মাতুল”। এই বলিয়া সকলের সহিত তাহার পরিচয় করিয়া দিল। তিনি বিচরণ করিয়া একে একে তাহাদিগের সকলকে

প্রণাম করিলেন। প্রণাম করিতে করিতে তাঁহার পৃষ্ঠ বেদন করিতে লাগিল। কিন্তু কেহই তাহাকে প্রণাম করিল না। ইহাতে বিস্মিত হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন- “আমাকে প্রণাম করিতে পারে এমন কেহ নাই কি?” শাক্যগণ উত্তরে বলিলেন- “বৎস, যাহারা তোমার কনিষ্ঠ তোমার আগমনের পূর্বে তাহারা সকলে জনপদে গিয়াছে। “অনন্তর তাঁহারা অতি যত্নের সহিত বিড়ুঢ়ভের আহালাদির ব্যবস্থা করিলেন।

বিড়ুঢ়ভ কপিল বস্তুতে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া স্বদেশের দিকে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তিনি সম্মুখাগারে যে ফলকাসনে বসিয়াছিলেন এক দাসী তাহা দুগ্ধ মিশ্রিত জ্বলে ধৌত করিতে গিয়া বলিল- “দাসীর পুত্র এই আসনে বসেছিল। তাই উহা শোধনের জন্য ধৌত করিতেছি।” বিড়ুঢ়ভের একজন অনুচর ভুলক্রমে একখানা অস্ত্র ফেলিয়া গিয়েছিল। সে উহা লইতে গিয়া দাসী বিড়ুঢ়ভের প্রতি অবজ্ঞাসূচক যে কথা বলিয়াছিল, তাহা শুনিতে পাইল। সে জিজ্ঞাসা করিয়া প্রকৃত রহস্য জানিতে পারিল। বাসব ক্ষত্রিয়া মহানামের ঔরসে এক দাসীর গর্ভে জন্মিয়াছেন। এই কথা সে তাহাদের সকলকে বলিল। বাসব ক্ষত্রিয়া দাসী কন্যা একথা নিয়া মহাকোলাহল হইল। তাহা শুনিয়া বিড়ুঢ়ভ প্রতিজ্ঞা করিলেন “আমি যে আসনে বসিয়াছিলাম তাহা দুগ্ধ দিয়া ধৌত করুক, আমি রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইহাদের গলরক্তে আবার এই আসন ধৌত করিব।”

বিড়ুঢ়ভ রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলে অমাত্যেরা রাজাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল। তাঁহাকে দাসী কন্যা দিয়াছেন বলিয়া রাজা শাক্যদিগের প্রতি ক্রোধান্বিত হইলেন। তিনি বাসবক্ষত্রিয়া ও কুমারকে যে ধনাদি দিতেন তাহা রহিত করিলেন এবং দাস দাসীদিগকে লোকে যে পরিমাণে দেয় রাজাও তাহাদের সেই পরিমাণে দেওয়াইতে লাগিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে বুদ্ধ কোশলরাজ ভবনে উপস্থিত হইলেন। রাজা বুদ্ধকে প্রণাম করিয়া বলিলেন- “ভদন্ত, শুনলাম আপনার জ্ঞাতীরা আমাকে দাসী কন্যা দিয়েছেন। কাজেই আমি তাহাকে ও তাহার পুত্রকে যে বৃত্তি দিতাম তাহা বন্ধ করিয়াছি। দাস-দাসীরা যাহা পাইবার উপযুক্ত কেবল তাহাই দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছি।” ইহা শুনিয়া বুদ্ধ বলিলেন- “মহারাজ, শাক্যেরা অন্যায় কাজ করিয়াছে, কন্যা দান করিতে হইলে স্বজাতীয় কন্যা

দান করাই কর্তব্য। তবে একটি কথা বলিবার আছে, বাসব ক্ষত্রিয়া ক্ষত্রিয়ের ঔরস জাতা এবং ক্ষত্রিয়েরই গৃহে মহীষিপদে অভিষিক্ত। বিড়ুঢ়ও ক্ষত্রিয়রাজ পুত্র। মাতৃগোত্রে কি আসিয়া যায়? পিতৃগোত্রই আভিজাত্যের প্রমাণ। ইহা ভাবিয়া প্রাচীন পণ্ডিতেরা এক দরিদ্র কাষ্টহরিণীকে মহীষিপদে বরণ করিয়াছিলেন এবং তাহার গর্ভজাত পুত্র দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত এই বারানসী নগরেই রাজপদ লাভ করিয়া কাষ্টবাহন রাজা নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। রাজা বুদ্ধের উপদেশ বাণী শুনিয়া চিত্ত প্রসাদ লাভ করিলেন। পিতৃগোত্রই আভিজাত্যের প্রমাণ। ইহা বুঝিতে পারিয়া বাসব ক্ষত্রিয়া ও তাহার পুত্রের জন্য পূর্ববৎ বৃত্তি প্রভৃতির ব্যবস্থা করিলেন।

কোশল রাজের সেনাপতির নাম বঙ্কুল। তাহার স্ত্রী বন্ধ্যা ছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহাকে বলিলেন- তুমি পিত্রালয়ে গিয়া থাক। অনন্তর মল্লিকা কুশীনগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে যাইতে যাইতে তিনি ভাবিলেন- “শাস্তাকে দর্শন ও বন্দনা করিয়া যাইব।” তিনি জেতবনে প্রবেশ করিয়া ভগবান তথাগতকে বন্দনা করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। তখন তথাগত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন- “মল্লিকা, তুমি কোথায় যাইতেছ?” “আমার স্বামী আমাকে পিত্রালয়ে পাঠাইতেছেন।” “কেন?” “আমি অপুত্রক।” “যদি ইহাই কারণ হয়, তবে তোমার গমনের প্রয়োজন নাই। তুমি গৃহে প্রত্যাবর্তন কর।” এই কথা শ্রবণে মল্লিকা অতিমাত্রায় তুষ্ট হইয়া বুদ্ধকে বন্দনা করিয়া পুতিগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। বঙ্কুল মল্লিকাকে ঘরে ফিরিয়া দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন- “প্রিয়ে তুমি ফিরিলে কেন?” ভগবান আমাকে ফিরিতে বলিয়াছেন। বঙ্কুল বলিলেন- “ভগবান বোধ হয় ইহার কোন সঙ্গত কারণ দেখিতে পাইয়াছেন।” অনন্তর মল্লিকা অচিরে গর্ভধারণ করিলেন। তাহার দোহদ বা স্বাদ জন্মিল। তিনি স্বামীকে বলিলেন- “স্বামী আমার দোহদ জন্মিয়াছে।” “কি দোহদ?” আমার ইচ্ছা হইতেছে যে, “বৈশালীর মঙ্গল পুষ্কারিনীর জলে তথাকার গনরাজ দিগের অভিষেক হইয়া থাকে, তাহাতে অবতরণ করিয়া স্নান ও জলপান করি।” সেনাপতি “তাহাই হইবে” বলিয়া সহস্র ধনুর তুল্য বল একধনু গ্রহণ করিলেন। মল্লিকাকে রথে তুলিয়া অগ্রসর হইলেন এবং যথাসময়ে বৈশালীতে প্রবেশ করিলেন।

এই সময়ে লিচ্চবিদিগের অর্থ ধর্ম্মানু শাসক মহালী নামক এক অন্ধ ব্যক্তি

নগর দ্বার সমীপে বাস করিতেন। তিনি বন্ধুল সেনাপতির সহিত একই আচার্য গৃহে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। দ্বারের গোবরাটে যখন বন্ধুলের রথ প্রতিহত হইল, তখন সেই শব্দ শুনিয়া তিনি বলিলেন - “এই শব্দ বন্ধুল সেনাপতি মল্লের রথের। আজ লিচ্ছবিদিগের মহাভয়ের কারণ উপস্থিত হইয়াছে।”

মঙ্গল পুষ্করিনীর ভিতরে-বাহিরে বলবান প্রহরী থাকিত। উহার উপরে লৌহ জাল বিস্তৃত থাকিত। এইজন্য উহাতে পাখী পর্যন্ত যাইতে পারিত না। সেনাপতি রথ হইতে অবতরণ করিয়া খড়গাঘাতে পাখী দিগকে দূর করিয়া দিলেন। লৌহজাল ছেদন করিলেন। ভিতরে গিয়া ভার্য্যাকে স্নান ও জলপান করাইলেন। স্বয়ং স্নান করিয়া মল্লিকাকে রথে তুলিলেন এবং নগর হইতে নিষ্ক্রমণ করিয়া রাজপথে উপস্থিত হইলেন। এদিকে রক্ষকেরা গিয়া লিচ্ছবিদিগকে এই সংবাদ দিল। লিচ্ছবি রাজেরা শুনিয়া অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের মধ্যে পঞ্চাশত ব্যক্তি পঞ্চাশত রথে আরোহণ করিয়া বন্ধুল মল্লকে ধরিবার জন্য বাহির হইলেন। তাঁহারা প্রথমে মহালীকে এই কথা জানাইলে মহালী বলিলেন- “তোমরা বন্ধুলকে ধরিবার জন্য যাইওনা। বন্ধুল একাই তোমাদের সকলকে বধ করিবেন।” তাহারা বলিলেন- “আমরা যাইবই যাইব।” “যদি তোমরা একান্তই যাও, তবে যেখানে দেখিবে একটা রথের চক্রের নাভি পর্যন্ত মৃত্তিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তখন সেই স্থান হইতে ফিরিবে। যদি তাহা না কর তবে সেখানে গিয়া সম্মুখে বজ্র ধ্বনির ন্যায় ধ্বনি শুনিবে সেখান হইতে ফিরিবে; যদি তাও না কর তবে সেখানে তোমাদের রথের ধুরে ছিদ্র দেখিতে পাইবে। সেখান হইতে ফিরিবে। ইহার পর আর অগ্রসর হইওনা।” তাহারা মহালীর কথামত প্রত্যাবর্তন না করিয়া বন্ধুলকে অনুধাবন করিতে লাগিল। তাহাদিগকে দেখিয়া মল্লিকা বলিলেন- “স্বামীন, অনেক গুলি রথ দেখা যাইতেছে” বন্ধুল বলিলেন - “বেশ, যখন সবগুলি রথ এক সারিতে একখানা রথের মত দেখা যাইবে তখন আমায় জানাইবে” অনন্তর যখন শ্রেণীবদ্ধ রথগুলি একখানা রথের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল তখন মল্লিকা বলিলেন, “স্বামীন, কেবল একখানা রথের অগ্রভাগ দেখা যাইতেছে” তবে তুমি অশ্বরশি ধর, ইহা বলিয়া তিনি মল্লিকার হস্তে রশ্মি দিলেন এবং নিজ রথে দাড়াইয়া ধনুকে জ্যা আরোপন করিলেন, অমনি তাঁহার রথ চক্র নাভি পর্যন্ত মৃত্তিকায় প্রোথিত হইল। লিচ্ছবিরা সেখানে গিয়া উহা দেখিতে পাইলেন, কিন্তু তাহারা নিবৃত্ত হইলেন না।

বন্ধুল কিয়দুর অগ্রসর হইয়া ধনুকে টংকার দিলেন। উহা বজ্র ধ্বনির ন্যায় দ্রুত হইল। কিন্তু লিচ্ছবির সেখান হইতেও ফিরিলেন না, অনুধাবন করিয়াই চলিলেন। অতঃপর বন্ধুল রথে দাড়াইয়া একটা শর নিক্ষেপ করিলেন। উহা সেই পঞ্চশত রথের অগ্রসর ভেদ করিল এবং ঐ পঞ্চশত রথের প্রত্যেকের দেহের কটি বন্ধ গ্রস্থি ছিল। সেই অংশ ভেদ করিয়া পৃথিবীতে প্রবেশ করিল। কিন্তু রাজারা যে বিদ্ধ হইয়াছেন তাহারা বুঝিতে পারিলেন না। তাহারা “তিষ্ঠ” “তিষ্ঠ” বলিয়া অনুধাবন করিয়াই চলিলেন। বন্ধুল রথ থামাইয়া বলিলেন- “তোমরা মৃত; মৃতের সহিত আমার যুদ্ধ হইতে পারেনা।” “কি? আমাদের মত লোক মৃত? এ নতুন কথা বটে,” “বিশ্বাস না হয় তোমাদের মধ্যে যে সর্বাঞ্চে আছে, তাঁহার কটিবন্ধ খোল। অগ্রবর্তী ব্যক্তি তাহাই করিলেন এবং খুলিবামাত্র প্রাণ ত্যাগ করিয়া পতিত হইলেন। তখন বন্ধুল বলিলেন- “তোমাদের সকলেরই এই দশা; এখন স্ব-স্ব গৃহে গিয়া যেরূপ ব্যবস্থা করা কর্তব্য তাহা কর। দারা পুত্রকে উপদেশ দাও এবং কর্মাদি খোল।” লিচ্ছবিরাজাগণ এইভাবে প্রাণত্যাগ করিলেন।

অতঃপর বন্ধুল মল্লিকাকে লইয়া কোশল রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিলেন। মল্লিকা একে একে ষোলবার যমজ পুত্র প্রসব করিলেন। এই কুমারেরা সকলেই বলবান ও সর্ববিদ্যা বিশারদ হইলেন। ইহাদের প্রত্যেকের এক সহস্র অনুচর ছিলেন। ইহারা যখন পিতার সহিত রাজ ভবনে যাইতেন, তখন ইহাদের সমাবেশে রাজাঙ্গন পূর্ণ হইত। একদিন একটা মিথ্যা মকদ্দমায় পরাজিত কয়েকজন লোক বন্ধুলকে দেখিবামাত্র মহারবে চীৎকার করিতে করিতে জানাইল যে বিচারকেরা মিথ্যা অভিযোগকারীদের পক্ষপাতিত্ব করিয়াছেন। তখন বন্ধুল বিচার গৃহে গিয়া তথ্যানুসন্ধান করিলেন এবং যাহার ধন তাহাতেই দেওয়াইলেন। ইহাতে জনগণ মহাশব্দে তাঁহাকে সাধুবাদ দিতে লাগিল। রাজা ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া এত তুষ্ট হইলেন যে, অন্য সকল অমাত্য হইতে বন্ধুলকেই উচ্চ পদবী দিয়া বিনিশ্চয়ের ক্ষমতা দিলেন। বন্ধুল তদ্বধি বিনাপক্ষ পাতে বিচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতে ভূতপূর্ব বিচারকদিগের উৎকোচ লাভের পথ বন্ধ হইল। তাই তাহারা বন্ধুলের বিরুদ্ধে রাজার মন ভাঙ্গিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বলিতে লাগিলেন- বন্ধুল নিজেই রাজপদ গ্রহণের অভিসন্ধি করিয়াছেন। রাজা তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিলেন।



কিছুতেই নিজের চিত্তকে সন্দেহ মুক্ত করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন- “বন্ধুলকে যদি এখানেই বধ করি, তাহা হইলে লোকে আমায় নিন্দা করিবে।” এ জন্য তিনি কতকগুলো লোক নিয়োগ করিয়া প্রত্যন্ত প্রদেশে বিদ্রোহ ঘটাইলেন এবং বন্ধুলকে ডাকাইয়া বলিলেন- “শুনিতেছি, প্রত্যন্তে নাকি বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে, তুমি তোমার পুত্র দিগকে লইয়া সেখানে যাও এবং দস্যুদিগকে ধরিয়া আন”। তিনি বন্ধুলের সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণ সহযোদ্ধা পাঠাইলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন, “ইহার এবং ইহার বত্রিশ জন পুত্রের মাথা কাটিয়া আনিবে।” বন্ধুল প্রত্যন্তে যাইতেছেন শুনিয়াই রাজা যে সকল দস্যু নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহারা পলায়ন করিলেন। বন্ধুল প্রত্যন্ত বাসী দিগকে স্ব-স্ব বাসস্থানে পুনঃ স্থাপিত করিয়া এবং তাহাদিগকে নির্ভয় প্রদান করিয়া প্রত্যাগমন সময় যখন রাজধানীর অনতিদূরে উপস্থিত হইলেন। তখন সেই মহাযোদ্ধাগণ তাঁহার এবং তদীয় বত্রিশ জন পুত্রের শিরচ্ছেদ করিল।

সেই দিন মল্লিকা অগ্রশ্রাবকদ্বয় প্রমুখ পঞ্চশত ভিক্ষু নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। পূর্বাহ্নেই তাঁহার নিকট স্বামী পুত্র সকলের শিরচ্ছেদ সংবাদ লিখিত পত্র আসিল। কিন্তু এই দুঃসংবাদ পাইয়াও তিনি কাহাকেও কিছু বলিলেন না, তিনি পত্রখানি কটিদেশে রাখিয়া ভিক্ষুদিগের পরিচর্যা করিতে লাগিলেন। তাহার পরিচারিকা ভিক্ষুদিগকে ভাত দিবার পর ঘৃত ভাণ্ড আনিবার সময় হস্ত চ্যুত হইয়া স্থবিরগণের সম্মুখে ভগ্ন হইল। তাহা দেখিয়া ধর্মসেনাপতি বলিলেন- “চিন্তা করোনা, যাহা ভঙ্গুর তাহাই ভগ্ন হইয়াছে”। তখন মল্লিকা কটিদেশ হইতে পত্র খানি বাহির করিয়া বলিলেন- “লোকে আমাকে এই পত্রে জানাইয়াছে যে, আজ আমার স্বামীসহ বত্রিশটি পুত্রের শিরচ্ছেদ হইয়াছে। যখন ইহা শুনিয়াও শোকগ্রস্ত হই নাই, এখন ঘৃত ভাণ্ড ভগ্ন হইলেও চিন্তিত হইব কেন?” অতঃপর ধর্মসেনাপতি অনিত্য সম্বন্ধে দেশনা করিয়া বিহারে প্রত্যাবর্তন করিলেন। মল্লিকা বত্রিশটি পুত্র বধুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন- “তোমাদের নিরপরাধ পতিগণ তাহাদের কর্মানুরূপ ফল লাভ করিয়াছে। অতএব, শোক করিও না। রাজার প্রতিও যেন তোমাদের বিদ্বেষভাব না জন্মে” রাজার চরেরা ইহা শুনিয়া তাহারা যে নিরপরাধ, তাহা রাজাকে জ্ঞাপন করিল। রাজা অনুতপ্ত হইয়া মল্লিকার গৃহে গমন করিলেন এবং তাহার ও তদীয় পুত্র বধুদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মল্লিকাকে বর দিতে চাহিলেন। মল্লিকা বলিলেন-

“মহারাজ, আপনি বর দিতে ইচ্ছা করিলে উহা গ্রহণ করিলাম।” রাজা তাহার মনোভাব প্রকাশ করিয়া প্রস্থান করিলে তিনি প্রেতাপিত্ত প্রদান করিলেন এবং স্নানান্তে রাজার নিকট গিয়া বলিলেন- “মহারাজ, আপনি বর দিতে চাহিয়েছেন, আমার অন্য বরে প্রয়োজন নাই। আমি এবং আমার বত্রিশটি পুত্রবধু স্ব-স্ব পিত্রালয়ে যাইতে পারি এই অনুমতি দিন।” রাজা ইহাতে সম্মতি দিলেন। মল্লিকা পুত্র বধুদিগকে স্ব-স্ব পিত্রালয়ে প্রেরণ করিলেন এবং নিজে কুশীনগরে নিজের পিত্রালয়ে গেলেন। অতঃপর রাজা বন্ধুলের ভাগিনেয় দীর্ঘ কারায়নকে সেনাপত্য প্রদান করিলেন। এই রাজা আমার মাতুলকে বধ করিয়াছেন ভাবিয়া দীর্ঘ কারায়ন রাজার দোষ অন্বেষণ পরায়ন হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

নিরপরাধ বন্ধুলের প্রাণ সংহারের পররাজা অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তাঁহার চিত্তে শান্তি ছিলনা। রাজ্যে সুখ ছিলনা। তখন শাস্তা শাক্যদিগের উড়ুম্প নামক নগরের নিকটে বাস করিতেছিলেন। রাজা সেখানে গিয়া উদ্যানের অনতিদূরে স্কন্ধবার স্থাপন করিলেন এবং কারায়নের হস্তে পঞ্চরাজ চিহ্ন দিয়া একাকী গন্ধ কুটিরে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর যাহা ঘটিল তাহা ধর্মচেত্য সূত্রানুসারে বলিতে হইবে।

রাজা গন্ধকুটিরে প্রবেশ করিলে কারায়ন রাজ চিহ্নগুলি লইয়া বিড়ুঢ়ভকে রাজা করিলেন এবং প্রসেনজিতের জন্য কেবল একটি অশ্ব এবং একটি পরিচারিকা রাখিয়া শ্রাবস্তীতে চলিয়া গেলেন।

প্রসেনজিত শাস্তার সহিত প্রিয় সংলাপ অবসানের পর প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখেন তাঁহার সৈন্য ও পরিচারকগণ চলিয়া গিয়াছে। তিনি সেই পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন এবং ভাগিনা (অজাতশত্রুকে) বলিয়া বিড়ুঢ়ভকে বন্দী করিবেন এই উদ্দেশ্যে রাজ গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি রাত্রিকালে রাজগৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন নগরদ্বার বন্ধ হইয়াছে। কাজেই বহিঃস্থ একটা গৃহে শয়ন করিলেন। এবং শীতলতা ও ক্লান্তি বশতঃ রাত্রিকালেই তাঁহার মৃত্যু হইল। রাত্রিপ্রভাব হইলে- “কোশলরাজ অনাথ অবস্থায় দেহত্যাগ করিয়াছেন” দেখিয়া পরিচারিকা ক্রন্দন করিয়া উঠিল। লোকেরা অজাতশত্রুকে এই সংবাদ দিল। তিনি মহা সমারোহে মাতুলের শরীর কৃত্য যথোচিতভাবে সম্পাদন করিলেন।

বিড়ুঢ়ভ রাজ্য লাভের পর পূর্বশত্রুতা স্মরণ করিয়া শাক্যকুল নির্মূল করিবার অভিপ্রায়ে মহতী সেনাদল সহ কপিলবস্তুর দিকে যাত্রা করিলেন। ঐ দিন প্রত্যুষকালে বুদ্ধ ত্রিভূবন পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, তাহার জ্ঞাতীকুল বিনষ্ট হইবে। তিনি স্থির করিলেন যে, জ্ঞাতিগণের প্রতি দয়া প্রদর্শন অবশ্য কর্তব্য। তিনি পূর্বাহ্নে ভিক্ষায় বাহির হইলেন, ভিক্ষা চর্যাতে গন্ধকুঠিরে গিয়া সিংহ শয্যায় শয়ন করিলেন এবং সায়াহ্ন কালে আকাশ পথে কপিলবস্তুতে গিয়া একটা পত্রহীন বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। ইহার অনতিদূরে বিড়ুঢ়ভের রাজ্য সীমায় একটা সান্দ্রচ্ছায়া প্রকাণ্ড ন্যাগ্রোধ বৃক্ষ ছিল। বিড়ুঢ়ভ বুদ্ধকে দেখিয়া তাঁহার নিকট গিয়ে বন্দনান্তে জিজ্ঞাসা করিলেন- “ভদন্ত, এই গরমের সময় কি কারণে পত্রহীন বৃক্ষের মূলে বসিয়া আসেন। আসুন ঐ নিবিড় ছায়াযুক্ত বৃক্ষের মূলে বসুন।” বুদ্ধ বলিলেন, “কোন প্রয়োজন নাই, মহারাজ জ্ঞাতিগণের ছায়াই সর্বাপেক্ষা শীতল।” বিড়ুঢ়ভ বলিলেন- “শাস্তা জ্ঞাতিগণের রক্ষার্থে আগমন করিয়াছেন।” তিনি শাস্তাকে প্রণাম করিয়া স্থায়ী রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন, শাস্তাও আকাশপথে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু বিড়ুঢ়ভ শাক্য দিগের অপরাধ ভুলিতে পারিলেন না। তিনি দ্বিতীয়বার অভিযানে বাহির হইলেন। কিন্তু সেবারও শাস্তাকে সেখানে দেখিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার তৃতীয়বারের চেষ্টাও এইরূপে ব্যর্থ হইল। কিন্তু যখন তিনি চতুর্থবার যুদ্ধে যাত্রা করিলেন, তখন শাস্তা শাক্যদিগের পূর্বকৃত কর্ম বিচার পূর্বক দেখিলেন, তাহারা নদীতে বিষ প্রক্ষেপ করিয়া যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, কিছুতেই তাহার ফল এড়াইতে পারা গেলনা। এই জন্য তিনি চতুর্থবারে কপিলবস্তুতে গেলেন না। রাজ বিড়ুঢ়ভ স্তন্যপায়ী শিশু পর্যন্ত সম্মুখে সম্প্রাপ্ত সমস্ত শাক্যের প্রাণ সংহার করিয়া তাহাদের গলরক্তে সেই ফলকাসন ধৌত করিলেন। তিনি এইরূপে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিয়া কোশলে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

সমস্ত জ্ঞাতি গোষ্ঠি পূর্বজন্মে আনন্দের সহিত মৎস্য করাতে এই কর্মফলে এইরূপ মৃত্যুবরণ ও দুঃখ দায়ক বিপাক ভোগ করিতে হইয়াছে। সেই কারণে অপরের প্রাণী হত্যা দর্শনে প্রফুল্ল না হইয়া বরং করুণাপরায়ণ হওয়াই উচিত।

বোধিসত্ত্ব মৎস্য হত্যা না করিলেও কিন্তু অপরের হত্যা করিবার সময় আনন্দিত হইয়াছিলেন। সেই কারণে বুদ্ধ জ্ঞাতিগণ অর্থাৎ শাক্য বংশ ধ্বংস

হবেন দিব্যজ্ঞানে তাহা জ্ঞাত হইয়া তাঁহার বিপুল করুণার সঞ্চার হইয়াছিল। তাই তিনি শাক্যরাজ্যে উপস্থিত হইয়া প্রথর রৌদ্রে পত্র বিহীন বৃক্ষমূলে উপবেশন অবস্থায় প্রকাশ করিয়াছিলেন- “জ্ঞাতি ছায়াই শীতল, শান্তি দায়ক”

স্বকীয় বিপাক ভোগ হেতু বুদ্ধের বর্ণিত গাথা :

(১) অহং কেবটু গামম্‌হি আহ্‌ কেবটু দারকো,  
মচ্ছকে ঘাতিতে দিস্বা জনযিং সোমনসসকং

(২) তেন কস্ম বিপাকেন সীস দুক্‌খং মম আন্দু  
সক্সে সন্ধাচ হঞিৎসু যদা ইনি বিড়ুঢ়ভো।

অনুবাদ : বিপাক বিমুক্ত ভিক্ষুগণ; আমি অতীতে কৈবর্ত গ্রামে জেলের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। জ্ঞাতিগণের মৎস্য হত্যা করিতে দেখিয়া আমি অজ্ঞানতা বশতঃ অন্তরে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম। এই অকুশল হেতু অন্তিম জন্মে বুদ্ধত্বলাভ করিয়াও কোন কোন সময় কষ্টদায়ক শিরঃপীড়া ভোগ করিতে হইয়াছে। তথা সমস্ত শাক্যবংশ ধ্বংসের হেতুও হইয়াছে। সুতরাং কৃতকর্মের বিপাক হইতে রক্ষা পাইবার সাধ্য কাহারো নাই।

### দশম বিপাক

জগতে যখন ফুস্‌স বুদ্ধ আবির্ভূত হইয়াছিলেন তখন আমাদের বুদ্ধাঙ্কুর শ্রদ্ধাহীন মাৎস্য্য পরায়ন কৃপণ ব্যক্তির পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অপরকে দান দেওয়া তিনি পছন্দ করিতেন না। একদা নগরবাসী জনগণ বুদ্ধ ও তাঁর শ্রাবক সংঘকে গো-দুগ্ধপক্ব উত্তম পরমান্ন দান দিয়াছিল। ইহা দর্শন করিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন-এই নেড়া মাথা শ্রমণগণ কোন কাজ করেনা, শুধু আলস্য পরায়ন হইয়া বসিয়া বসিয়া অপরের প্রদত্ত অনু-পানীয় ভোগ করে এবং শুইয়া শুইয়া দিন কাটায়। এইরূপ শ্রমণগণকে এত উৎকৃষ্ট অমৃতসম স্বাদযুক্ত গো-দুগ্ধ সমন্বিত পায়স দান দিয়া লাভ কি? ইহাদিগকে শক্ত যবান্ন খাইতে দেওয়া উচিত। এইরূপ মাৎস্য্য চিন্তে বাচনিক কর্ম বিপাকে বহু সহস্র বৎসর নরক যন্ত্রনা ভোগ করিয়াও বর্ষা তিন মাস অতি শক্ত যবান্ন পরিভোগ করিতে হইয়াছে। শক্ত যবান্ন খাদ্য পরিভোগ বুদ্ধের পক্ষে একান্ত অপরিভোগ্য। বুদ্ধের যবান্ন পরিভোগের বিষয় নিম্নরূপ জ্ঞাতব্য :

ভগবান বুদ্ধ বৈরঞ্জ দেশে নালেকু নিম্ববৃক্ষ মূলে পঞ্চশত ভিক্ষু সমভিব্যাহারে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন বৈরঞ্জ ব্রাহ্মণ বুদ্ধের আগমন বার্তা শুনিয়া সপারিষদ বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া অভিবাদনাদি না করিয়া আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। আলাপে মুগ্ধ হইয়া বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করিলেন। ক্রমান্বয়ে ব্রাহ্মণ ত্রিশরণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমরণ উপাসকত্ব বরণ করিয়া নিলেন। বুদ্ধ প্রমুখ শ্রাবক সংঘকে খাদ্য ভোজ্যাদি যাবতীয় চতুঃপ্রত্যয় দান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলেন। বর্ষা তিনমাসও সেখানে যাপন করার জন্য প্রার্থনা করিলেন। ভগবান তুষ্ণীভাবে সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। ইহা বুদ্ধের দ্বাদশ বর্ষের বর্ষাবাস। এই বর্ষা বাস উদ্যাপন করিয়াছিলেন- বৈরঞ্জ দেশের নালেকু নিম্ববৃক্ষমূলে। অগ্রশ্রাবক-মহাশ্রাবক প্রমুখ পঞ্চশত ভিক্ষুসহ তথায় বর্ষাবাস উদ্যাপন করিবেন বলিয়া অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন।

দেবপুত্র মার সাধারণতঃ বুদ্ধের প্রতি অপ্রসন্ন। এই কারণে মাররাজ বৈরঞ্জ ব্রাহ্মণ ও তথাকার জনগণের মনে বুদ্ধকে নিমন্ত্রণের বিষয় বিস্মরণ করাইয়া দেয়। সুতরাং ভিক্ষু সংঘ ভিক্ষাচর্যায় বাহির হইয়া এক চামচ অনুও লাভ করিতেন না। এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ভগবান বুদ্ধ এবং তাঁহার সহগামী পাঁচশত শিষ্য আহারের জন্য মহামুশকিলের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। কর্ম নিয়তি ভোগ ব্যতীত কোন উপায় না থাকায় মহাকারুণিক বুদ্ধকে নীরবে সহ্য করিতে হইয়াছে। তখনকার অতি দুর্ভিক্ষ ও দূরাবস্থা নিবারণে আয়ুস্মান আনন্দ তখন অশ্ব ব্যবসায়ী পঞ্চশত বনিকের নিকট গিয়া অশ্ব খাদ্য যব ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছিলেন। উহার খোসা ছাড়াইয়া পাক করার পর ভোজনের জন্য বুদ্ধকে সমর্পণ করিতেন। ভগবান বুদ্ধ সর্বজ্ঞতা জ্ঞানে পূর্বকৃত বিপাকের বিষয় জ্ঞাত হইয়া যবান্ন পরিভোগে পরিতৃপ্ত থাকিতেন। বৈরঞ্জ দেশে যবান্ন পরিভোগের বিষয় ভগবান অপদানে স্বয়ং বর্ণনা করিয়াছেন।

- (১) ফুস্স বুদ্ধস্সাহং পবচনে সাবকে পরিভাসযিং,  
যবং খাদথ ভুজ্জথ নেব ভুজ্জথ সালযো
- (২) তেন কস্ম বিপাকেন তেমাসং খাদিতং যবং  
নিমন্ততো ব্রাহ্মণেন বেরঞ্জয়ং বসিংতদা।

অনুবাদ : বিপাক বিমুক্ত অন্তরায় দর্শী ভিক্ষুগণ। আমি অতীতে ফুস্স

বুদ্ধের শাসনকালে শ্রাবক সংঘকে মাৎসর্য চিন্তে-যব খাও, কোমল শালী অনুভোজন করিওনা বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়াছিলাম। সেই বাচনিক কর্ম বিপাকে আমি বৈরঞ্জদেশে বর্ষাবাস উৎযাপন করিয়াছিলাম। তখন আমি তিন মাস যাবৎ যবানু পরিভোগ করিয়াছিলাম।

-০-

## একাদশ বিপাক

অতীতে বোধিসত্ত্ব গৃহপতিকূলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অতি শক্তিশালী ছিলেন বটে, কিন্তু শরীর ছিল হ্রস্ব। তাই তাহার নাম রাখিয়াছিল-বামন। সে সময় একজন বিখ্যাত মল্লযোদ্ধা বীর জম্বুদ্বীপে সকল মল্লযোদ্ধাকে পরাজয় করিয়া অবশেষে বোধিসত্ত্বের অবস্থান নগর সম্প্রাপ্ত হইল। সে মল্লযুদ্ধ জয়ে কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইলে সর্বশ্রেষ্ঠ মল্লবীর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল। বোধিসত্ত্ব বেঁটে বামন হইলেও তাহার শরীরের শক্তি ছিল অসাধারণ। পঞ্চহস্তীর বলে বলীয়ান ছিলেন। নিজে অসীম বলে বলীয়ান বিধায় বক্সিং ও কুস্তি খেলিবার বাসনা জন্মিয়াছিল। বুদ্ধাঙ্কুর কুস্তিবীর হওয়া আশ্চর্যের বিষয় বটে, কিন্তু সংসার চক্রে সব সম্ভব হইতে পারে। বোধিসত্ত্বের প্রবল শক্তি খ্যাতিতে তাঁহার সাথে কেহ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সাহস করিতনা। তাই তিনি বারানসীর সর্বশ্রেষ্ঠ বীর বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

তৎকালে মল্লরাজ কর্তৃক প্রতিপালিত এক মল্লবীরের আবির্ভাব হইয়াছিল। মল্ল দেশের সমস্ত বীরকে মল্লযুদ্ধে পরাজিত করিয়া মল্লবীর নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। মল্ল দেশে তাহার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার বীর না থাকায় মধ্যম দেশে প্রতিদ্বন্দ্বী বীর অন্বেষণে বাহির হইল। ক্রমে বারানসী শহরে আসিয়া উপনীত হইল। এই নবাগত মল্লবীরের সাথে কেহ বীরত্ব প্রদর্শনে সমর্থ থাকিলে আসিবার জন্য নির্দেশ দিয়া শহরের চতুর্দিকে ঘোষনা করিল। তখন মহাবীর বোধিসত্ত্ব ঐ প্রচারিত খবর শুনিয়া মনে করিল “এই মল্লবীর আমাদের দেশের শহরে আসিয়া স্থায়ী বীরত্বের কৃতিত্ব প্রদর্শনে প্রয়াসী হইয়াছে। আমি তাহার সাথে শক্তিয়ুদ্ধে তাহাকে পরাজিত করিয়া স্থায়ী শক্তি প্রদর্শনে দেশের গৌরব রক্ষা করিব”। বোধিসত্ত্ব এই সংকল্পের বশবর্তী হইয়া মল্লবীরের সহিত

কুস্তি ধরিয়া বীরত্ব প্রদর্শনের স্বীকৃতি দিয়া সর্বত্র ঘোষণা করেন। মল্লবীর বামন বীরকে দেখিয়া বলিল, “এই বেঁটে বামনকে পরাজয় করিতে আমার দুই হাতের প্রয়োজন হইবে না। এক হাতে তাহাকে পরাস্ত করিব। যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সম্মত হও তবে নির্দিষ্ট দিন ধার্য করিয়া জন সাধারণ্যে ঘোষণা কর।” সুতরাং উভয় বীরের মতে দিন নির্ধারণ করিয়া নগরে ভেরী চরাইয়া সর্বত্র ঘোষণা করাইল। শুধু ইদানীং যে কুস্তি বা বলী খেলার প্রচলন আছে তা নয়। পূর্বেও কুস্তি ও বলী খেলার প্রচলন ছিল। বক্ষ্যমান বীরের খেলা মহা জনসংঘ অতি আগ্রহ সহকারে দর্শনে প্রয়াসী হইল। এই মহাবীরের লড়াই ছাড়াও মহিষের লড়াই, গরুর লড়াই, এমনকি নিম্নস্তরের মোরগের লড়াই দর্শনেও মানুষেরা আগ্রহশীল ছিল। বলীখেলার বিস্তৃত মাঠে নির্দিষ্ট দিনে উভয় বীরের খেলা দর্শনের জন্য অগণিত লোকের সমাগম হইল। উভয় বীর তাহাদের খেলার প্রস্তুতি গ্রহণ করিল এবং একে অপরের মুখোমুখি হইবা মাত্র বোধিসত্ত্ব বামন বীর হঠাৎ অতর্কিতে মল্লবীরকে দু’হাতে ধরিয়া আকাশের দিকে নিক্ষেপ করিলেন, নীচে পতনের সময় পুনঃ ধরিয়া উচু আলিঙ্গিত মাটিতে এমন জারে আঘাত করিলেন তাহাতে মল্লবীর ধরাশায়ী হইল। তাহার কোমরের হাড় ভাঙ্গিয়া গেল। সে মুমূর্ষু হইল। এদিকে বোধিসত্ত্বের বীরত্ব দর্শনে মহাজনগণ, করতালি, বাহবা, জয়ধ্বনি ও নানা প্রকার উপটোকনে বামনবীর বোধিসত্ত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিল।

সেই মল্লবীরের বিজয় হইতে বোধিসত্ত্ব বামন বীর পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রখ্যাত মহাবীর রূপে সর্বত্র পরিচিতি ও সমাদৃত হইয়াছিলেন। যাহাকে বর্তমান সভ্য জগতে ‘চ্যাম্পিয়ন’ রূপে আখ্যায়িত করে। বোধিসত্ত্ব সর্বস্থানে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। সুতরাং কুস্তিবীর হিসাবেও তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মহাবীর হওয়া স্বাভাবিক। কুস্তিবীরের খেলার বীরত্ব প্রদর্শন অবসানে মল্লবীরের প্রতি বোধিসত্ত্বের করুণার সঞ্চর হয়। সেই কারণে মল্লবীরকে বোধিসত্ত্ব নিজের গৃহে নিয়া যান এবং সম্পূর্ণ আরোগ্য ও নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত ঔষধ-পথ্য চিকিৎসা ও সেবায়ত্নে সুস্থ করিয়া তোলেন। অতঃপর তাহাকে নানা প্রকার সদুপদেশ দানে আপ্যায়িত করিয়া তাহার নিজ বাড়ীতে পাঠাইয়া দেন। ইহার পর হইতে বোধিসত্ত্ব মহাবীর জীবনে কখনো বীরত্ব প্রদর্শন করেন নাই। উক্ত কৃত কর্মে সংবেগ প্রাপ্ত হইয়া পরবর্তী জীবনে শক্তি পরীক্ষা ত্যাগ করিয়াছিলেন।

এই কর্ম-বিপাকে সংসার চক্রে জন্মে জন্মে কোমর ও পৃষ্ঠ বেদনা প্রায়শঃ

ভোগ করিতে হইয়াছে। পরিশেষে মহাপরিনির্বাণ লাভের পূর্বে বুদ্ধের মহাপুণ্য প্রভাবময় জীবনেও শারীরিক দুঃখ বেদনা ভোগ করিয়াছিলেন।

কর্মফল ভোগের বিষয় বুদ্ধ স্বয়ং নিম্নরূপ বর্ণনা করিয়াছেন-

(১) নিব্বুদ্ধে বত্ত মানম্‌হি মল্লপুত্তং নিহে ধয়িং

তেন কম্ম বিপাকেন পিটিঠ্‌ দুক্‌খং আহুতি

হে, আমার প্রিয় শিষ্য ভিক্ষুগণ! আমি পূর্বে বুদ্ধের অনুৎপত্তিকালে কুস্তিবীর হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং মল্লদিগের মহাবীর মল্লকে পৃষ্ঠ ও কোমরের হাড় ভাঙ্গিয়া দিয়া নিগ্রহ সহকারে পরাজয় করিয়াছিলাম। উক্ত প্রাক্তন কর্ম বিপাকে বর্তমান বুদ্ধ হইয়াও কটিতে বেদনা দুঃখ ভোগ করিতেছি।

-০-

## দ্বাদশ বিপাক

অতীতে গৌতম বোধিসত্ত্ব গৃহপতি কূলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন তিনি চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া ইহাতেই জীবিকা নির্বাহ করিতেন। তথায় জনৈক শ্রেষ্ঠী শ্রেষ্ঠীপুত্রের আশ্রয় রোগের চিকিৎসা করিয়াছিলেন। সে আরোগ্য লাভ করিয়াও ঔষধের মূল্য ও চিকিৎসকের পারিশ্রমিক না দেবার উদ্দেশ্যে আরোগ্য হয় নাই বলিয়া মিথ্যা বলিয়াছিল। শ্রেষ্ঠীপুত্রের বক্তব্য শ্রবণে কবিরাজ মনে করিলেন এই লোকটি আমার প্রাপ্য না দিবার জন্য প্রতারণার আশ্রয় নিয়াছে। আমার ঔষধের মূল্য না দিলেও কিছু আসে-যায় না। কিন্তু আমার ঔষধের অগুণ বর্ণনা কিছুতেই সমীচিন নহে। সুতরাং এই অকৃতজ্ঞ মুর্থকে অন্য ঔষধ প্রয়োগে সমুচিত শিক্ষা দিব। এই অকুশল চিন্তা করিয়া ক্রোধ চিত্তে তাকে এক প্রকার বিরোচন ঔষধ প্রয়োগ করিলেন। শ্রেষ্ঠী পুত্রের পুনঃ পুনঃ দাস্ত হইয়া পরিশেষে মৃত্যু বরণ করিল। এইরূপ রোগী ও চিকিৎসক বর্তমান যুগেও আছে বৈকি? এইরূপে শ্রেষ্ঠী পুত্রকে হত্যা করিবার মহাপাপ কর্মের ফলে তিনি অতিদীর্ঘ কাল অপায় যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মনুষ্য জন্ম লাভ করিলেও মহামারী রোগে বহুবার মৃত্যুবরণ করিতে হইয়াছে। পরিশেষে অন্তিম জন্মে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াও আশ্রয় রোগ ভোগ করার পর পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন।



ভগাবান সম্যক সবুদ্ধ চুন্দ নামক স্বর্ণাকারের প্রদত্ত “শূকর মন্দর” নামক পুষ্টিকর মোদক ভোজনে অচিরে আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন। অতিরিক্ত দাস্ত হওয়ায় শরীর অতি দুর্বল হয়। (বুদ্ধ ১০টি ছদন্ত হস্তীর বল ধারণ করিতেন। ১টি ছদন্ত হস্তী এক হাজার মানুষের বল ধারণ করে)। তিনি মল্লদেশে আগমনের সময় স্থানে স্থানে বিশ্রামাগারে পুনঃ পুনঃ বিশ্রাম করিয়া আসিতে হইয়াছে। স্বীয় কৃত প্রাক্তন কর্ম বিপাকের কারণে এই দুঃখ ভোগের বিষয় প্রধান সেবকের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন- “আনন্দ, আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছি।”

বুদ্ধ অপদানে স্বয়ং বর্ণনা করেছেনঃ-

তিকিচ্ছকো অহং আসিং সেট্ঠি পুত্তং বিরেচয়িং

তেন কস্ম বিপাকেন হোতি পাক্খন্দিকা মম।

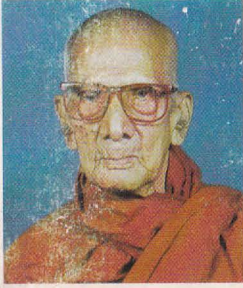
এবং জিনো বিয়াকাসি ভিক্খু সংঘস্স অগ্গতো,

সম্মভিঞা বলপ্পত্তো আনোতত্তে মহাসরে।।

সংসারবর্ত বিপাক বিনির্মুক্ত ভিক্খুগণ! পূর্ব জন্মে আমি নিপুণ চিকিৎসক হইয়া জনৈক শ্রেষ্ঠী পুত্রকে চিকিৎসা করিয়াছিলাম। সে আরোগ্য হইয়া আমাকে মিথ্যা বলিয়া প্রতারণা করাতে আমি তাহাকে বিরেচন ঔষধ প্রয়োগে হত্যা করিয়াছিলাম। সেই অকুশল বিপাক জনিত এই অন্তিম জন্মে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াও কর্ম বিপাক হইতে নিষ্কৃতি না পাইয়া আমাশয় রোগাক্রান্ত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা দায়ক দুঃখ ভোগ করিয়াছি।

সমাপ্ত

## লেখক পরিচিতি



মহামান্য উপসংঘরাজ সুবোধিরত্ন মহাধেয়ো ১৯০২ সালের ৭ই জানুয়ারী তারিখ সোমবার চট্টগ্রাম জেলার দাশখালী থানার প্রসিদ্ধ শীলকূপ গ্রামে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ভরত চন্দ্র বড়ুয়া ও মাতার নাম রমাপতি বড়ুয়া। তিনি ভাই ও এক বোনের মধ্যে তিনি সর্ব কনিষ্ঠ। তাঁর গৃহী নাম রাখা হয় দশরথ বড়ুয়া। শীলকূপ প্রাথমিক বিদ্যালয়েই লেখাপড়ায় তাঁর হাতে খড়ি। ৭ (সাত) বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহারা এবং ৮৩ (তিরিশ) বৎসর বয়সে মাতৃহারা হন। পিতার মৃত্যুর পাঁচ বছর পর পঢ়িয়ার প্রসিদ্ধ ঠেংগরপুণি মন্দিরে নির্বাণগামী সংঘরাজ তেজবন্ত বঙ্গচন্দ্র মহাধারি এবং নির্বাণগামী ৭ম সংঘরাজ পরম শ্রদ্ধেয় জ্ঞানাত্ম্য

মহাস্থবিরের নিকট ১৯১৪ সালে বার বৎসর বয়সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তাঁর নাম রাখা হয় দশমণ্ড শ্রামণ। তিনি একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে ও অধ্যয়ন করেন। তিনি ১৯২০ সালে পরম শ্রদ্ধেয় অভয়তিষ্য মহাস্থবিরের আদেশে নিজ প্রচেষ্টায় রেঙ্গুনে গমন করেন। ১৯২১ সালের শেষ মাসে দশ বৎসর বয়সে তিনি রেঙ্গুনের ইভাইকুন বিহারের অধ্যক্ষ সংঘনায়ক উদ্ধীর্তর মিত্র ঈশসম্পদা গ্রহণ করেন এবং নাম রাখা হয় সুবোধিরত্ন ভিক্ষু। অতঃপর রেঙ্গুনে তিনি বার্মিজ ভাষায় ত্রিপিটক অধ্যয়ন করেন এবং বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে সবিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

বৌদ্ধ প্রতিরূপ দেশ বার্মায় পালি ভাষায় সমস্ত বিনয় পিটকের উপর বার্মার প্রখ্যাত বৌদ্ধ ভিক্ষুদের তত্ত্বাবধানে কঠিন পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে তিনি গৌরব অর্জন করেন এবং তখনকার প্রচলিত মুদ্রা (১০০) একশত রূপার টাকা তাঁকে সম্মানে পুরস্কৃত করা হয়। তাঁর ভিক্ষু জীবনের মধ্যে বার্মার চেম্টাকা, পেনুএণ্ড, মিসিয়া, আকিয়াব বৌদ্ধ বিহার সহ ১০ (দশ) বৎসর এবং পরে রেঙ্গুনের নট্টাজি বিহারে ২৫ (পঁচিশ) বৎসর জীবন যাপনের পর ১৯৫৬ সালে দেশে চলে আসেন। তারপর উখিয়ার ভালুকিয়া এর একটি বিহারে ৫ (পাঁচ) বৎসর অতিবাহিত করেন। চন্দনাইশের মধ্যম জোয়ারা বিহারে ১ (এক) বৎসর। আসামের মারগেরিটা মন্দিরে ১ (এক) বৎসর, পুনরায় বার্মার ধাইজ্যা নামক এক স্থানীয় বিহারে ৪ (চার) বৎসর অতিক্রম করেন। আবার দেশে ফিরে এসে রাজা পালং বিহারে ৩ (তিন) বৎসর উখিয়ার রেজুরকুল বৌদ্ধ বিহারে ২ (দুই) বৎসর, চন্দনাইশের দক্ষিণ জোয়ারা পরমানন্দ বিহারে ৭ (সাত) বৎসর। আনোয়ারার মুৎসুন্দী পাড়া বিবেকারাম বিহারে ৩ (তিন) বৎসর, পঢ়িয়ার ঠেংগরপুণি সার্বজনীন শাক্যামি বিহারে ৫ (পাঁচ) বৎসর অতিবাহিত করেন। অতঃপর বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতির সাদর আহ্বানে ১৯৮৯ সাল হতে অদ্যাবধি চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ পদে সমাসীন আছেন। তিনি একজন শীলবান পণ্ডিত বৌদ্ধ ভিক্ষু। বৌদ্ধ ধর্মে পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি শ্রীসদ্ধর্মচার্য, পরিমুক্তি বিশারদ, ত্রিপিটকালংকার, সদ্ধর্মরত্নাকর উপাধি সমূহে ভূষিত হন। তিনি ৭৬ (ষিয়াত্তর) বৎসর ভিক্ষু জীবন অতিবাহিত করে চলেছেন। বর্তমানে তিনি সাতান্নকই বৎসরেরও উর্ধ্বে জরাজীর্ণ, দ্বাশী পীড়িত একজন বর্ষীয়ান ভিক্ষু। তাঁর স্বতিশক্তি এখনও প্রখর। এই বই সহ তাঁর লিখা অন্যান্য পাণ্ডুলিপিকলো হলো “পালি কথা শিক্ষা”, “ধর্মচক্র সাধনা পদ্ধতি।” এখনও তিনি বার্মিজ ভাষা ভালভাবে লিখে ও পড়তে পারেন।

পরিশেষে, আমার পরমারাধ্য গুরুদেব উপসংঘরাজ উদন্ত সুবোধিরত্ন মহাধেয়ো নীরোগ অবস্থায় শতবর্ষ পরমায়ু লাভ করুক, ইহাই প্রার্থনা করি।